G.92
3/369
4/576
8

11/76

11/76

ওঁ

বিচার-চন্দ্রোদয়

LIBRARY
No............
Shri Shri Ma Anandamayee Ashram
BANARAS.

—গ্রন্থকার—
শ্রীকালিদাস ভট্টাচার্য্য
অধ্যাপক—হুগলী কলেজ

১৽

ওঁ

বিচার-চন্দ্রোদয়

৭।৭৮

শ্রীকালিদাস ভট্টাচার্য্য
অধ্যাপক, হুগলী কলেজ

LIBRARY
No.............
Shri Shri Ma Anandamayee Ashram
BANARAS.

প্রথম সংস্করণ
অগ্রহায়ণ—১৩৪৮

প্রকাশক :—শ্রীমৎ ভক্তিপ্রকাশ ব্রহ্মচারী

সনাতন ধর্ম্মপ্রচারিণী সভা

শ্রীশ্রীনগেন্দ্র মঠ

২/বি, রামমোহন রায় রোড, কলিকাতা।

মূল্য ॥০ আট আনা মাত্র।

এই গ্রন্থের ১ হইতে ১২ নং ফর্ম্মা কলিকাতা ৮, আশুতোষ শীল লেনস্থ গিরিশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে, ১৪ হইতে ১৬ নং ফর্ম্মা কলিকাতা ১২ নং হরিতকী বাগান লেনের গোলাপ প্রিন্টিং হইতে, এবং ১৩নং ফর্ম্মা ও বাকি অংশ কলিকাতা ১০৬ নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটস্থ দামোদর প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে মুদ্রিত।

—গ্রন্থকারের নিবেদন—

যাঁহা হ'তে বিশ্বের উদ্ভব, স্থিতি ও ভঙ্গ হ'য়ে থাকে, যিনি উপনিষদের
মধ্যে আপন স্বরূপ ব্যক্ত ক'রে রেখেছেন, যিনি সাধককে
অনুভব শক্তি দিয়া থাকেন, যিনি সাধক সাজিয়া
আপনাকে অনুভব করিবার চেষ্টা ক'রে
থাকেন, যিনি হৃদয়ে বিচার শক্তিরূপে
ফুটে উঠিতেছেন, সেই সদা শুদ্ধ
মুক্ত বুদ্ধ নিরঞ্জনের চরণে
"বিচার চন্দ্রোদয়"
নিবেদিত হইল।

তাঁরই প্রেরণায় তাঁর প্রিয় সন্তান শ্রীমৎ শঙ্কর তীর্থ যতি-মহারাজ প্রভৃতি
মহাপুরুষগণ লিখিত কয়েকটি হিন্দি নিবন্ধ অবলম্বনে (কল্যাণে প্রকাশিত)
বাংলার সাধক শ্রেণীর শুভ সম্পাদনে সমর্থ ভাবিয়া সংসারের
স্বরূপ বিচার প্রভৃতি কয়েকটি প্রবন্ধ লিখিত
হইয়াছে। ইতি—

—গ্রন্থকার—

"শান্তি আশ্রম" চুঁচুড়া, হুগলী

অগ্রহায়ণ, ১৩:৮

—প্রকাশকের নিবেদন—

শ্রীভগবানের অপার করুণায় নানাবিধ বিপর্য্যয়ের মেঘ অতিক্রম করিয়া **"বিচার-চন্দ্রোদয়"** সাধনচন্দ্রের জ্যোতিতে জ্যোতিষ্মান্ হইয়া প্রকাশিত হইল। যাহাতে সকলেই সহজে উপনিষদের গভীর তত্ত্বগুলি ধারণা করিতে এবং উচ্চ বিষয়ের আলোচনায় সময়ের সদ্ব্যবহার করিয়া মনুষ্য-জীবনের শ্রেষ্ঠ লক্ষ্য যে সাধন, তাহাতে তৎপর হইতে পারেন—এই পুস্তক-প্রকাশের তাহাই একমাত্র উদ্দেশ্য। যদিও এই পুস্তকের সমস্ত প্রবন্ধই **"শ্রী শ্রীনগেন্দ্র মঠ"** এর মুখপত্র **"সত্য-প্রদীপ"** পত্রিকায় ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হইয়াছিল তথাপি যাহাতে **সত্য-প্রদীপ** এর গ্রাহক ও পাঠক ভিন্ন অপরেও ইহা আস্বাদন করিয়া ধন্য হইতে পারেন, তজ্জন্যই ইহা গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইল। গ্রন্থের অধিকাংশ প্রবন্ধই ঔপনিষদিক, কিন্তু সেই দুর্ব্বোধ্য জ্ঞান-গম্ভীর বিষয়গুলি গ্রন্থকার তাঁহার সাধনজনিত অনুভবের তুলিকায় এমন সহজ ও সরলভাবে বিবৃত করিয়াছেন যে ধর্ম্মপিপাসু তত্ত্বজিজ্ঞাসু অতি অল্প শিক্ষিত সাধকও ইহা পাঠে আনন্দিত ও উপকৃত হইতে পারিবে।

এক্ষণে ইহা পাঠে একজন ও উপকৃত হইলে গ্রন্থকারের পরিশ্রম ও অর্থব্যয় এবং আমাদের চেষ্টা সার্থক হইবে। ওমিতি

—প্রকাশক—

সূচীপত্র

বিষয়		পৃষ্ঠা
১।	সংসারে সংসারী সাজিও সংসারী হইও না ...	১
২।	মহাবাক্য বিচার	১২
৩।	পঞ্চকোষের বিচার	১৫
৪।	দ্বৈতভাবের বিচার	২১
৫।	অসক্তিরনভিষ্ঙ্গঃ পুত্রদারগৃহাদিষু	৩০
৬।	ভগবান কোথায় ?	৩৪
৭।	কর্ম্মভূমি না জেলখানা ?	৩৯
৮।	সংসারের স্বরূপ বিচার	৪২
৯।	মনের স্বরূপ বিচার	৫৩
১০।	আত্মজ্যোতির স্বরূপ বিচার	৫৮
১১।	মুক্তির স্বরূপ বিচার	৬৫
১২।	পুনর্জন্ম মানিব কেন ?	৭৬
১৩।	ব্রহ্মবিদ্যা বিচার	৯১
১৪।	উপাসনার ভেদ বিচার	১০৫
১৫।	পঞ্চভূতের বিচার	১১৬

——o——

LIBRARY
No............
Shri Shri Ma Anandamayee Ashram
BANARAS.

বিচার চন্দ্রোদয়

সংসারে সংসারী সাজিও, সংসারী হইও না

ছোট বৌমার কলেরা হয়েছে বেলা ৮টায় ; সমস্ত দিন ছুটাছুটি, টেলিগ্রাম, ডাক্তার বৈদ্যের হুকুম তামিল, সেবা শুশ্রূষা সব বৃথা হ'ল ; রাত্রি ৮টার সময় সব ফর্সা ; বৌমাকে দাহ করিয়া ফিরিয়া আসিয়া দেখি যে, বাবার কলেরা হয়েছে ; মন ভাঙ্গিয়া পড়িল ; বাড়ীর সকলের মুখেই বিষাদের ছায়া ; দু'দিন অত্যন্ত পরিশ্রম ও সেবা যত্নের পর আজ সকলেই হতাশ হইয়া পড়িয়াছে ; বাবা বলিতেছেন, "আমার দৃষ্টিশক্তি ক্রমেই লোপ পাইতেছে, দেওয়ালে টাঙান শ্যামা মায়ের ছবিখানি আর ভাল দেখ্‌তে পাচ্ছি না"। ছবিখানি নামাইয়া খুব কাছে লইয়া ধরিলাম ; তবুও তিনি ভাল দেখিতে পাইলেন না। আমি হতাশ হইয়া পড়িলাম ; ভাবিলাম, আর কয়েক মুহূর্ত্ত—তারপর সব শেষ হবে ; তীব্র বৈরাগ্য দেখা দিয়াছে, বাবার শেষ-কৃত্য সমাধার পর সংসার ছাড়িব, মরণ-রহস্য বুঝিবার জন্য সাধু সন্ন্যাসীর পায় লুটাইব, হিন্দু-শাস্ত্র সব ঘাঁটিব, লোকালয় হ'তে দূরে নির্জ্জনে একাকী থাক্‌ব। এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে মনে হইল, বাবা এখনও কথা কইচেন, সন্ন্যাসী হইবার অনুমতিটা নিয়ে রাখি। এই মনে ক'রে বাবাকে বল্‌লাম্, "আচ্ছা, বাবা, আপনি ত সুদূর পাঞ্জাব কাশ্মীর পর্য্যন্ত বেড়িয়েছেন, অনেক সাধু অসাধু দেখেছেন, দুনিয়ার কোন্ পথ ভাল ?"

উত্তর—"সত্য পথ"।

প্রশ্ন—কোন্ আশ্রম ভাল ?

উত্তর—"সংসার আশ্রম"।

প্রশ্ন—শান্তির উপায় কি ?

উত্তর—"সদা সন্তোষ"।

দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর শুনিয়া পিঠে যেন সপাং করিয়া চাবুক পড়িল; কোথায় সন্ন্যাসী হইবার জন্য প্রাণ ছট্‌ফট্‌ করছে, অনুমতি চাইতে গেলাম, অনুমতি ত মিলিল না, সংসারী হইতে হইবে, শেষ মুহূর্ত্তে পিতার আদেশ। হায়, হায়, এ কি হ'ল ?

মুমূর্ষু পিতার আদেশ সত্য পথে চলিতে হইবে। মিথ্যার আশ্রয় লইতে পাইব না। অথচ সংসার আশ্রমে থাকিতে হইবে। সংসার আশ্রমে থাকা মানে বিবাহ করিতে হইবে; স্ত্রী পুত্র কন্যা পালন করতে হবে; বাড়ী ঘর চাই; মেয়েদের সৎ পাত্রে দান করতে হবে; ছেলেদের সব শিক্ষা দিতে হ'বে; অর্থকরী বিদ্যা শেখাতে হবে। আমার অবর্ত্তমানে তারা ডাল ভাত খেতে পায়, মোটা ভাত মোটা কাপড়ের অভাব না হয় তার যোগাড় করে রেখে যেতে হবে। এ সব করতে গেলে পয়সা দরকার। পয়সা রোজগার করতে হবে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাপ মারা গ্রাজুয়েট; এখন প্রশ্ন হ'চ্ছে পয়সা রোজগারের জন্য কোন্ পথ আশ্রয় করি ?

যদি 'ল' পাশ করে দেশের আদালতে ঘরের খেয়ে ওকালতি করি, পয়সা রোজগার হয়ত হতে পারে; কিন্তু মিথ্যার আশ্রয় নিতেই হবে। মক্কেলকে মিথ্যার উপদেশ দিতেই হবে; 'হয়'কে নয় করতেই হবে; সত্য পথে থেকে ওকালতির ব্যবসা চলে না; সত্যপথে ওকালতি ব্যবসা চলে—এ বিশ্বাস যার আছে, সে মনকে চোক ঠারে মাত্র; অসম্ভব; আদালতের একটি নাম ধর্ম্মালয়; আইনগুলির উদ্দেশ্য সত্য উদ্‌ঘাটন; কিন্তু আইনজীবীকে সত্যের আবরণে মিথ্যাকে সাজাতে হয়, কখন বা মিথ্যার আবরণে সত্যকে সাজাতে হয়; ধর্ম্মালয়ে কথায় কথায় ঘুষের ব্যবস্থা; নথী দেখতে চাও, ঘুষ দিতে হবে; জবাবের নকল নিতে চাও, ঘুষ দিতে হবে; সমন জারি করিতে চাও, পেয়াদাকে ঘুষ দিতে হবে; এমন কি হাজিরা দাখিল করিতে যাও, পেষকারকে একটি দুয়ানি ঘুষ দিতে হবে। ধর্ম্মালয়ে এত অধর্ম্ম। এ পথে পয়সা রোজগার আমার পোষাবে না; মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে পয়সা রোজগারের অনুমতি নাই; সত্যপথে থাকতে হবে, ধর্ম্মকে আশ্রয় করে থাকতে হবে।

ব্রাহ্মণ বংশে জন্মিয়াছি; হিন্দু আমি; রমাকান্ত সিদ্ধান্ত বাগীশের সন্তান বলিয়া পরিচয় দি; ন্যায়রত্নের পৌত্র; বিদ্যাবাচস্পতি মহাশয়ের প্রপৌত্র; ন্যায়বাগীশের বৃদ্ধ প্রপৌত্র হইয়া অধর্ম্মের আশ্রয়ে পয়সা রোজগার করা আমার পক্ষে অসম্ভব।

পূর্ব্ব পুরুষেরা সকলেই অধ্যাপক পণ্ডিত ছিলেন; তাঁহাদের সকলেরই টোল ছিল; রাজ সরকার হইতে বৃত্তি পাইতেন। মনের মধ্যে খুঁজিয়া দেখিতে লাগিলাম; কোন্ বৃত্তি প্রবল? অধ্যাপনা করিয়াই পয়সা রোজগার করিব স্থির করিলাম, হয় ত ভুল করিলাম, হয়ত পয়সা রোজগার কম হবে; তা হ'ক; শান্তির পথে থাকৃতে পারবো; গৃহ শিক্ষকরূপে কাজে নামিলাম; ক্রমে কলেজে অধ্যাপনার কাজ জুটিয়া গেল।

নবম বৎসরে উপনয়ন সংস্কার সাধিত হ'ল; তখন কিন্তু উপনয়ন লাভ হয় নাই; সন্ধ্যাহ্নিক করি, কিন্তু মিথ্যাচারে; অর্থ বুঝি না; কেবল মাত্র আওড়াইয়া যাই; যতই জ্ঞান বাড়িতে লাগিল, মিথ্যাচার ধরা পড়িতে লাগিল; মিথ্যাচারের অভ্যাস আর কতকাল বজায় রাখা যায়? পুঁথি পাঠে অর্থবোধ হইতে লাগিল; কিন্তু অনুভূতিতে ফুটে উঠে না। মিথ্যাচারের খেলাই চলিতে লাগিল; সত্যপথে চল্‌বো বল্‌লেই কি চলা যায়? পদে পদে বিঘ্ন, পদে পদে বাধা; কলেজে ছাত্রদের পরীক্ষার খাতা ফেরত দেওয়ার নিয়ম নাই; সেই খাতার সাদা কাগজগুলি আমার ছেলেদের ব্যবহার কর্‌তে যদি দি, তা'হলে আমাকে সত্যভ্রষ্ট হতে হবে। আফিসের পেনসিল ছেলেকে দিলাম; কেহ জানিল না; কিন্তু অন্তর্যামীকে ত আর ফাঁকি দেওয়া যায় না; তিনি ত সব টের পাচ্ছেন; এখানে আমাকে চুরির পাপ স্পর্শ করিল; সত্যভ্রষ্ট হইলাম। কলেজে আছি, হঠাৎ একখানি জরুরি পত্রের জবাব দিতে হবে; সরকারী কাগজে পত্র লিখিলাম, সরকারী কালি ব্যবহার করিলাম; এখানে আমার চুরি করা হইল, সত্যভ্রষ্ট হইলাম। আজ কলেজে অধ্যাপনার সময় খানিকটা সময় ছাত্রদের সহিত গল্প বা বাজে কথায় কাটাইলাম; সত্যপথে থাকিতে হ'লে অধ্যাপনার সময় অধ্যাপনা করাই আমার কর্ত্তব্য; সেটা না করায় আমাকে কর্ত্তব্যভ্রষ্ট ও সত্যভ্রষ্ট হইতে হইয়াছে। সত্যপথে চলিতে হ'লে কঠোর সাধনা চাই; দৃঢ় প্রতিজ্ঞা চাই;

সত্যপথে থাকিতে হইলে যত অসুবিধাই হ'ক্, যত ক্ষতিই হ'ক্, গ্রাহ্য করিব না,—এইরূপ একটা দৃঢ় প্রতিজ্ঞা গোড়া হইতে না থাকিলে সত্যপথে থাকা যায় না। এর জন্য চাই আপন কাজের উপর তীব্র দৃষ্টি রাখা, মনের নিভৃত কক্ষে কোন্ বৃত্তি জাগে, তা লক্ষ্য করা, মনে মুখে ও কাজে সামঞ্জস্য থাকৃছে কিনা সে বিষয়ে সদা সজাগ থাকা। এর জন্য চাই সর্ব্বশক্তিমানের নিকট আত্মসমর্পণ করিয়া শক্তি ভিক্ষা করা। ওরে তিনিই যে সত্যস্বরূপ; তাঁর শরণাপন্ন হ'লে, তাঁর চরণে গড়িয়ে পড়্‌লে আর কি ভয় থাকে রে! ওরে মন, তিনিই যে তোর যোগক্ষেম বহন ক'রে থাকেন; তুই কর্ত্তৃত্ব ছাড়্; অভিমান বিসর্জ্জন দে; নিরভিমান হ'য়ে তাঁর পাদপদ্মে লুটিয়ে পড়্; দেখবি তোর সকল অসুবিধা দূর হবে, সকল বাধা বিঘ্ন কেটে যাবে, সত্যালোকে মনের রুদ্ধ কক্ষ আলোকিত হ'বে, মনের আঁধার ছুটে যাবে, বিশালভাবে হৃদয়ের বিস্তৃতি দেখতে পাবি, সত্যের সন্ধান পাবি, সত্যের স্বরূপ বুঝতে পারবি, সত্যপথে থাকার সাধনায় সিদ্ধিলাভ করবি।

সংসার আশ্রমের কথা এখন একটু তলিয়ে বুঝতে হবে; সংসার-আশ্রম আছে বলেই অপর তিনটি আশ্রম বেঁচে আছে; সংসার-আশ্রমের ছেলেরাই ব্রহ্মচারী হয়ে বিদ্যা শিক্ষা করে; সংসারীর ছেলেরাই ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম জিয়াইয়া রাখিয়াছে; যতি, ব্রহ্মচারী, সন্ন্যাসী সকলেই অন্নবস্ত্রের জন্য সংসারীর নিকট ঋণী; সংসারী অভুক্ত থাকিয়াও অসময়ে আগত সন্ন্যাসী ভিক্ষুকদিগকে আহার যোগাইয়া নিজেকে কৃত কৃতার্থ মনে করে। ন্যায়পথে থেকে অর্থোপার্জ্জন করতে হয়; সেই অর্থে প্রতিপাল্যদিগকে প্রতিপালন করিতে হয়; সেই অর্থে দারা-পুত্রাদির ভরণপোষণ করিতে হয়; সেই অর্থে সাধু সন্ন্যাসীদিগকে খাওয়াইতে পরাইতে হয়; সেই অর্থে দুঃস্থ দুঃখীদের সেবা করিতে হয়; সেই অর্থে গরীব বিদ্যার্থীর বিদ্যাশিক্ষার ব্যবস্থা করিয়া দিতে হয়; সেই অর্থে বৃদ্ধের সেবা, গুরুজনের শুশ্রূষা, আর্ত্তের সেবা যত্ন, প্রতিবাসীর অভাব মোচন, দেবদেবীর পূজা, অতিথি-অভ্যাগতের সেবা, পীড়িতকে ঔষধদান ইত্যাদি করিতে হয়। তবেই দেখ, সংসারীর কর্ত্তব্য কী ভয়ানক শক্ত! বুকের রক্ত জল করে পয়সা রোজগার করতে হবে, আর সেই পয়সায় এই সকল কর্ত্তব্য পালন করতে হবে। সোজা ব্যাপার নয়; কী কঠোর ব্রত!

সংসারীর ব্রত উদ্‌যাপন কর্‌তে হ'লে চাই সাধনা। মাথা ঠাণ্ডা রেখে সকলের সহিত যথাযোগ্য ব্যবহার কর্‌তে হবে; নিজের আত্মাকে যেমন ভালবাসি, অপরের আত্মাকে তেমনি ভালবাসিতে হবে; নিজে ভাল খেলে পরলে যেমন তৃপ্তিলাভ করি, অপরে ভাল খেলে পর'লে তেমনি তৃপ্তিলাভ হবে, এটা অনুভূতিতে ফুটিয়ে তুল্‌তে হবে। বসুধৈব কুটুম্বকম্,—শুধু মুখের কথা নয়, কাজে ব্যবহারে দেখাতে হবে। নিজে না খেয়ে অপরকে খাওয়াতে হবে, নিজে না প'রে অপরকে পরাতে হবে। পরকে আপন ভাবতে হবে, তবে সংসার ধর্ম্ম পালিত হবে। রাগ-দ্বেষ জয়ের সুযোগ সংসার আশ্রমেই পাওয়া যায়; রাগের কারণ উপস্থিত হলেও রাগ হবে না, যদি দেখা দেয় অঙ্কুরেই তাকে টিপে মারতে হবে; কারুর হিংসা কর্‌তে পার্‌বে না; অপরের অনিষ্ট চিন্তা করতে পাবে না; কেউ গালি দিলে পাল্টা গালি দিতে পাবে না—

গালাগালি যদি দেয় কেউ
কুত্তা কর্‌তা হায় ঘেউ ঘেউ ঘেউ
তুমি তোল প্রেমের ঢেউ
ভেসে যাবে একটানা।—

হেসে খেলে নাওরে মন দুদিন বৈত নয়,—এই ভাব হৃদয়ে জাগিয়ে রাখ্‌তে হবে—হাসিমুখে কাজ করে যেতে হবে; ঝড় ঝাপটা অনেক উঠবে, কালমুখ কর্‌লে চ'লবে না; হাসিমুখে সব সহ্য করে যেতে হবে; "হারলেও ঘরের ভাত জিতলেও ঘরের ভাত" ব্যবহারে ফুটিয়ে তু'ল্‌তে হবে; "দুঃখেষু অনুদ্বিগ্নমনা সুখেষু বিগত স্পৃহঃ"—ভাবটি কাজে দেখাতে হবে। আসক্তি ছাড়তে হবে; কর্ত্তব্য করে যাও, ফলের বিষয় ভেব না; মুক্ত সঙ্গ হয়ে কাজ করে যেতে হবে; অনাসক্ত হয়ে সংসারীর ধর্ম্মপালন করে যেতে হবে। বনে পর্ব্বত গুহায় একাকী সাধন ভজন কর্‌লে তুমি এগিয়ে যাচ্ছ কিনা বুঝবে কেমন করে? সংসারে থাক্‌লে সংসারের মধ্যে থেকে সাধন ভজন করলে ক্রোধের কারণ উপস্থিত হবে, কামের মূর্ত্তি সামনে এসে দাঁড়াবে, তখন তোমার সাধন ভজনের কতটুকু এগিয়েছ তার পরিচয় পাওয়া যাবে; তখন যদি তুমি সংযত শান্ত অনুদ্বিগ্ন থাকিতে পার, তবে তুমি আদর্শ সংসারী, তোমার মুক্তি অদূরে।

এস সাধক, এস পাঠক, সর্ব্বভূতে আত্মদর্শন করিতে করিতে আদর্শ সংসারীর জীবন লাভ করিয়া মুক্তির পথ সুগম কর। মনে রাখিও সাধক, স্ত্রী পুত্র সাধনা পথের কণ্টক নয়, দ্রব্য দ্রবিণ তোমার পায়ের বেড়ী নয়, গেরুয়া কাপড়ে মুক্তি আসে না; মনই প্রকৃত বন্ধন, মনকে শুদ্ধ করতে হবে, মনকে কামনাবর্জ্জিত করতে হবে; শুদ্ধ, পবিত্র, কামনা-বর্জ্জিত মন মুক্তির পথ সুগম করে। তাই না শাস্ত্রমুখে শুনতে পাই,—

সংসার-বীজঃ মন এব বিদ্ধি
ন পুত্র ভার্য্যা দ্রবিণাদিকং হি।
সংসারো নাশঃ মনসো নাশঃ
ন বৈ গৃহস্থাশ্রমবর্জ্জনেন।

তা যেন হ'ল। কিন্তু বিবাহ জীবনে কি সুখ? নিরাময় সুখ কি মানুষ বিবাহ করলে ভোগ করতে পায়? সংসারে যে সব সুখের কথা শোনা যায়, সেগুলি দুঃখ-মিশ্রিত, প্রাজ্ঞলোকে দুঃখবিদ্ধ সুখকে সুখের মধ্যেই গণ্য করেন না। বিবাহের পর মানুষ স্ত্রীর বশীভূত হ'য়ে পড়ে; তার হুকুম তামিল করতে করতে জীবন কেটে যায়, স্বাধীনতাই সুখ, পরাধীনতাই দুঃখ; স্ত্রী-জিতস্ত আবার সুখ কোথায়? স্ত্রী-পুত্রাদি দ্বারা আবদ্ধ জীবের কখনও মুক্তি নাই। মানুষের দেহ দেহমল জাত; যাকে আমরা সুন্দরী যুবতী মনে করে কতই না আদর যত্ন করি, তাদের দেহও শুক্র-শোণিতাদি দেহমল জাত। জ্ঞানীরা বিন্মূত্র-সম্ভব স্ত্রীদেহ নিয়ে কি সুখ, কি প্রীতি পাবে? আত্মানুসন্ধানে যে সুখ, যে শান্তি, সে সুখ ত্যাগ করে দেহমল জাত স্ত্রীদেহ ভোগ করতে কি ইচ্ছা হয়? বেদপাঠ করলাম; গৃহী আমার গুরু; গৃহস্থাশ্রমী সাধারণতঃ অবিদ্যাগ্রস্ত, আমি হ'লাম মুমুক্ষু: রোগগ্রস্ত বৈদ্য পররোগ চিকিৎসক; তিনি আমাকে মুক্তির পথ কি করে দেখাবেন? আমার আশা মিট্‌ল না; আমি তাঁকে প্রণাম করে বিদায় নিয়ে এসেছি। মাগো, তোর অভয় চরণে শরণ নিলাম; ত্রাহি মাং তত্ত্ব-বোধেন ভীতং সংসারসর্পতঃ; সংসাররূপ সাপের ভয়ে আমি সদা ভীত সন্ত্রস্ত; অভয়দায়িনী মা আমার, সংসার ভয় দূর কর মা! সূর্য্য যেমন দিবানিশি ঘুরে বেড়াচ্ছে, এক মুহূর্ত্ত বিশ্রাম পায় না; তেমনি এই সংসারে জীব জন্মমৃত্যুর আবর্ত্তে ঘুরে মরছে, এতটুকুও শান্তি

নাই, দুদণ্ড পা মুড়ে বসে মা তোর অভয় পদের চিন্তার অবসর পায় না; বেদান্ত দর্শন প'ড়বার পরও যে সংসারে অনুরক্ত হয়, "তেভ্যঃ পয়ো ন মূর্খোঽস্তি", তার মত আর হস্তী মূর্খ নাই, শিয়াল কুকুর শুয়ারের ধর্ম্মই সে পালন করে। দুর্লভ মানব জন্ম লাভ করে শাস্ত্রাদি পাঠ কর্‌বার পর যদি সংসারের মায়ায়ই আবদ্ধ হয় তা' হ'লে মুক্তির জন্য চেষ্টা কর্‌বে কে? দারাপুত্রগৃহাসক্তই সংসারে পণ্ডিত বলে পরিচিত হয়, এর চেয়ে আশ্চর্য্যের বিষয় আর কি আছে?

মা তোর মায়ার কি অদ্‌ভুত শক্তি! দুনিয়ার সবাই তোর মায়ায় মুগ্ধ; সংসারে ত্রিগুণাত্মিকা মায়া দ্বারা যে আবদ্ধ না হয়, সেই প্রকৃত বিদ্বান্‌ ও মেধাবী এবং বেদান্তের মর্ম্ম সেই বুঝেছে। সংসারের বাঁধন ছেঁড়বার জন্যই লোকে বেদান্তাদি শাস্ত্র পাঠ করে; বেদাদি শাস্ত্র পাঠের পর যদি সংসারেই মেতে রইল—স্ত্রীপুত্র পরিবার নিয়ে ঘরকন্নাই কর্‌তে রইল, তবে তার বেদাধ্যয়ন বৃথা। বিয়ে কর্‌লেই ঘর দরকার; ঘরে আট্‌কে থাকার নামই বন্ধন; ক সুখং বন্ধনাগারে? বন্ধনাগারে আবার সুখ কোথায়? যারা অবুঝ, মন্দমতি মূর্খ, তারাই মানুষ হয়ে বিয়ে করে এবং ঘটীযন্ত্রবৎ জন্মমৃত্যু চক্রে ঘুরে মরে। দুর্নিবার মায়া! অপার ভব পারাবার!! কি ক'রে পার হব মা? পারের কড়ি নেই যে মা; ষাটটি বছর ধরে সংসারের সেবা করে এসেছি; মা তোর খেলামাটি নিয়েই এতদিন মেতেছিলুম; তোকে মনে পড়ে নি; তোর চরণ সেবা কর্‌বার প্রবৃত্তি জন্মায় নি; আমি মা তোর কুপুত্র; তাই বলে কি মা তুই বিমুখ হবি; কুপুত্র যদিও হয়, কুমাতা কখন নয় যে মা! পিতা শেষ নিঃশ্বাস ফেল্‌বার সঙ্গে সঙ্গে আদেশ দিয়ে গেলেন সংসারী হতে হবে; বাবা যে আমার সাক্ষাৎ দেবতা মা! পিতার আত্মা রুষ্ট হলে, আমার পূজা পাঠ জপ আহ্নিক ধর্ম্ম কর্ম্ম সবই যে মা বৃথা হয়ে যাবে;—

পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্ম্মঃ পিতাহি পরমং তপঃ।
পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রীয়ন্তে সর্ব্ব-দেবতাঃ॥
পিতা যস্য ক্বচিদ্ রুষ্টঃ ন তস্য কস্যচিদ্ গতিঃ।
জপো দানং তপো হোমঃ স্নানং তীর্থক্রিয়াবিধিঃ।
বৃথৈব তস্য সর্ব্বাণি কর্ম্মাণ্যন্যানি কানিচিৎ॥

এক দিকে পিতার আদেশ—অন্য দিকে বেদান্তের নির্দ্দেশ। একজনের

আদেশ সংসারী হও, অপরের নির্দ্দেশ সংসার ছাড়; দো-টানায় পড়ে প্রাণ যে মা বেরোয় বেরোয় হয়েছে। দ্বন্দ্বাতীত মা আমার দ্বন্দ্বের মোহ ঘুচিয়ে দাও মা, পথ দেখিয়ে দেও মা। আঁধার আঁধার, নিবিড় আঁধার!! পথহারা অন্ধ পথিক যে মা আমি!!! জ্যোতিষামপি তদ্ জ্যোতি যে মা তুই! তমসঃ পরমুচ্যতে—অজ্ঞান যে মা তোকে স্পর্শ করতে পারে না! তুই যে মা

অন্তর্জ্যোতি বহির্জ্যোতঃ প্রত্যক্ জ্যোতিঃ পরাৎপরঃ।
জ্যোতি র্জ্যোতিঃ স্বয়ং জ্যোতিরাত্মজ্যোতিঃ সারাৎসারঃ॥

এস মা, আঁধার পথে আলো দেখাও মা; দিশাহারা পথহারাকে পথ দেখাও মা!!

কি বল্‌লি মা? গৃহাশ্রমাৎ পরঃ ধর্ম্মঃ নাস্তি। গৃহস্থাশ্রম বন্ধনাগার নয়!! গৃহী হয়েও যদি মন থেকে গৃহের প্রতি, দারাপুত্রপরিবারের প্রতি আসক্তি ত্যাগ করতে পারে, সে নিশ্চয়ই মুক্তি লাভ করে! যে গৃহস্থ ন্যায়ানুমোদিত পথে অর্থোপার্জ্জন করে এবং সেই অর্থ সাহায্যে সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ ক'রে দেব দ্বিজে ভক্তি শ্রদ্ধা, সত্যে নিষ্ঠা, মন শুচি শুদ্ধ করতে যত্ন করে, সে নিশ্চয়ই মুক্তির সন্ধান পায়। যতি, ব্রতী, ব্রহ্মচারী বানপ্রস্থী এরা সকলেই গৃহীকে আশ্রয় করেই বেঁচে থাকে; গৃহস্থের অন্নেই প্রতিপালিত হয়। বশিষ্ঠাদি আচার্য্য জ্ঞানীরা সকলেই গৃহী ছিলেন। বেদবিদেরা বলেন, ধাপে ধাপে উপরে উঠতে হয়; গৃহস্থাশ্রম থেকে বানপ্রস্থ, বানপ্রস্থাশ্রম থেকে সন্ন্যাসাশ্রমে যেতে হয়। 'আশ্রমাদাশ্রমং গচ্ছেৎ'—এটাই ধর্ম্মশাস্ত্রের উপদেশ। লাফিয়ে তেতালায় উঠা যায় না, ধাপে ধাপে উঠ্‌তে হয়। গৃহস্থাশ্রম আশ্রয় কর, করিয়া কেবল নিজের ভরণপোষণ লইয়াই ব্যস্ত থাকিও না, আত্মীয়-স্বজনকে দেখিতে হবে; স্তব, স্তুতি, পূজার্চ্চনাদি দ্বারা দেবতাদিগের তুষ্টি সাধিতে হবে; বন্ধু বান্ধব আত্মীয়-স্বজনের সেবা করতে হবে; পুত্রোৎপাদন ক'রে উপযুক্ত পুত্রের উপর সংসারের ভার দিয়া গৃহ ত্যাগ কর; বানপ্রস্থী হও; নির্জ্জন ঝামেলাশূন্য শান্তি আশ্রমে বাস কর; তারপর সম্যক্‌রূপে কামনা-বাসনা হ্রাস হলে, ত্যাগ হ'লে, সন্ন্যাস অবলম্বন কর।

যাদের মনের তেজ কম, তাদের পক্ষে যৌবনে বিয়ে করে সংসারী হওয়াই শ্রেয়ঃ। তার কারণ শোন:—মানুষের যে পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয় আছে, তারা

বড়ই প্রমত্ত। যৌবনকালে তাদের বশে রাখা বড় কঠিন; চোখ চায় রূপ দেখতে, সুন্দরী যুবতীর রূপ পেলে চোখ আর কিছু চায় না; কান চায় প্রেমের গান শুন্‌তে, যুবতীর মুখে গান শুনতে সে খুব ভালবাসে; নাক চায় এসেন্স মাখা সুন্দরীর গায়ের গন্ধ শুঁক্‌তে; জিহ্বা চায় সুন্দরীর হাতের তৈরী খাদ্য আস্বাদন করতে; ত্বক্‌ চায় সুন্দরী যুবতীর স্পর্শসুখ অনুভব করতে। তবেই দেখ, পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয় যৌবনকালে মানুষকে একজোটে কি রকম ক'রে যুবতীর দিকে টানে; এ টান বড় বিষম টান; এই টানে প'ড়ে মানুষ কাম চিন্তায় অস্থির হয়ে পড়ে; কাম বাস করে রমণী-দেহে; তাই রমণীকে "কামিনী" বলে; কামিনীর মোহিনী মূর্ত্তির দিকে যার মন একবার ঢলেছে, তার ব্রহ্মচর্য্য রক্ষা করা ভার; যৌবনকালে অক্ষত বীর্য্য দেহে থাকিলে সাধারণতঃ মানুষের মন সদাই "চন্‌মন্‌" করিতে থাকে; স্ত্রী-সঙ্গ লাভের জন্য লালায়িত হয়। যাদের বিয়ে হয়েছে, তাদের বীর্য্য মধ্যে মধ্যে স্ত্রীগর্ভে নিষিক্ত হয় ব'লে ইন্দ্রিয়গুলি বাড়াবাড়ি করতে পারে না, তাদের বশে রাখা সহজ সাধ্য হয়ে পড়ে।

বিয়ে না করলে যে কত বিপদ আপদ ঘটে, পদস্খলন হ'বার কত বেশী সম্ভাবনা, তার দৃষ্টান্ত বিশ্বামিত্র ঋষি। তিনি বিবাহ করেন নি, অকৃতদার ছিলেন; এমন অবস্থায় জিতেন্দ্রিয় হ'য়ে নিরাহারে থেকে তিনি হাজার বৎসর ধ'রে কঠোর তপস্যা করেন। সেই অবস্থায় মেনকাকে দেখে ঋষির তপোভঙ্গ হয়; মেনকার সহবাসে শকুন্তলার জন্ম হয়। পরাশর মুনি কঠোর তপস্বী ছিলেন। তিনিও একদিন দাসকন্যা কালী-নাম্নী সুন্দরী যুবতীকে দেখে কামশরে জর্জ্জরিত হয়েছিলেন এবং উড়ুপ আশ্রয় করে তার সঙ্গে কেলি করেছিলেন; ফলে ব্যাসদেবের জন্ম হয়। যখন বিয়ে না করার এত বিপদ, তখন সাধারণ জীবের পক্ষে যৌবনে বিয়ে করে সংসারী হওয়াই উচিত।

বিয়ে না করবার পক্ষে যুক্তি হচ্ছে এই:—একা আছি, বেশ আছি, কোন ভাবনা নাই; টাকাকড়ির বড় বেশী দরকার হয় না; বিয়ে করলেই টাকা কড়ির খুব দরকার। বিয়ে করলেই টাকা রোজগারের ভাবনা জুটল, ভাবনায় ভাবনায় শরীর শুকিয়ে যায়; ধনচিন্তাতুরের আবার সুখ কোথায়? পয়সা কড়ি যদি রোজগার হল, আত্মীয়-স্বজন অমনি জ্বালাতন

আরম্ভ কর্‌ল, তাদের অভাব অভিযোগ মেটাও, গরীবের লোভ পড়্‌ল, তাদের জ্বালায় জ্বালাতন। ছন্নছাড়া ভিক্ষুক যেমন সুখী, স্বর্গাধিপতি বাসবও তেমন সুখী নন্‌। ত্রিলোকীর ন্যায় বিত্ত-বিভব কার আছে? টাকা পয়সা দ্রব্য দ্রবিণ ইন্দ্র অপেক্ষা বেশী আর কার আছে? তিনিই সুখী নন; কঠোর তপস্বী তাপস দেখ্‌লেই তাঁর ভয় হয়; পাছে তাঁর ইন্দ্রত্ব ধরে টান পড়ে; অমনি তিনি শাত 'শ' রকম বিঘ্ন সৃষ্টি কর্‌তে আরম্ভ ক'রলেন—অপ্সরা কিন্নরী পাঠিয়ে তপোভঙ্গের ব্যবস্থা কর্‌লেন। স্বর্গাধিপতি দেবরাজের যখন এই অবস্থা, তখন মানুষের আর কথাই কি? ব্রহ্মাপি না সুখী; বিষ্ণু মনোরমা লক্ষ্মীকে পেয়েও সদাই খেদ করে থাকেন; কেন না তাঁকে মধ্যে মধ্যে অসুরদের সহিত যুদ্ধ কর্‌তে যেতে হয়; শঙ্করও সদাই দুঃখ করে থাকেন; কেন না তাঁকে তপঃপরায়ণ দেববলে বলীয়ান্‌ দৈত্যগণের সহিত যুদ্ধে লিপ্ত হ'তে হয়। ধনীরা সুখে ঘুমুতে পায় না; সদাই চোর ডাকাতের ভয়। ধনী হ'ক বা নির্ধন হ'ক, পঞ্চ দুঃখের হাত থেকে কারও নিস্তার নাই; জন্ম-দুঃখ, জরাদুঃখ, মরণদুঃখ, গর্ভবাসে দুঃখ, বিষ্ঠামূত্রজনিত দুঃখ—এই পঞ্চবিধ দুঃখের হাত থেকে অব্যাহতি নাই। সংসারে থাক্‌তে গেলে তৃষ্ণাও আছে, লোভও আছে; তৃষ্ণালোভ হইতে উৎপন্ন দুঃখ বড়ই যন্ত্রণাদায়ক। "চাইতে যাওয়া" পরম দুঃখ, মরণের চেয়েও বাজে। পরের উপর যাকে নির্ভর ক'রে থাকতে হয়, সে বড় দুঃখী; "পরাশা" পরম দুঃখ। দিনে দিনে পলে পলে সে পুড়ে মরে। বেদাধ্যয়নের পর পয়সার জন্য যদি কাউকে ধনীর স্তবস্তুতি মোসাহেবি ক'রতে হয়, তার চেয়ে আর মর্ম্মান্তিক দুঃখ কি হ'তে পারে? একটা পেটের আবার ভাবনা কি? যেমন তেমন করে চলে যায়।

একোদরস্য কা চিন্তা পত্রমূলফলাদিভিঃ
যেন কেনাপ্যুপায়েন সন্তুষ্ট্যা চ প্রপূর্য্যতে।

দারা-পুত্র পরিবার, ঝি জামাই, আত্মীয় স্বজন বিপুল কুটুম্ব লইয়া ঘর সংসার যে করে সে চরম দুঃখ ভোগ করে;—"নেই নেই খাই খাই" মেটাতে মেটাতে তার প্রাণান্ত পরিচ্ছেদ। "হা হা দৈ দৈ" আর ঘোচে না।

নারীর স্বভাব বিবেচনা কর্‌তে গেলে বিবাহ করতে ভয় হয়? নারী জোঁকের মত পুরুষের রক্ত সদা চুষে খাচ্ছে; যে মূর্খ, সে নারীর হাবভাবে

মোহিত হ'য়ে পড়ে, নারী চরিত্র তলিয়ে বুঝ্‌তে পারে না। কান্তা ছলের বাঁধন কুটিল নয়ন হাসির আবরণে বিষ ঢেকে রেখে পতির ধন, মন, প্রাণ, সর্ব্বস্ব হরণ করে; সুতরাং স্ত্রীর মত পরম শত্রু আর কে আছে? তারপর ছেলে-পিলে হ'লে কচি কাচাদের চ্যাঁ ভ্যাঁ লেগেই আছে; রাত্রে সুনিদ্রা হওয়া অসম্ভব; সমস্ত দিন খেটে খুটে এসে যে একটু ঘুমিয়ে বাঁচ্‌ব, তার যোটি পর্য্যন্ত নেই। এ সব সত্ত্বেও বিয়ে ক'রে সংসারী হ'তে হবে; পিতার আদেশ। সংসারী হ'ব, অথচ শোকে দুঃখ বোধে আস্‌বে না। এমনটি হয় নাকি? এ যে সোণার পাথর বাটি!

এ কি বল্‌ছ মা? সংসারে সংসারী সাজ্‌বো, সংসারী হ'ব না? একের খেলা দেখ্‌তে হ'বে; মনকে শুদ্ধ কর্‌তে হ'বে; মনকে একের খেলা দেখ্‌বার উপযুক্ত ক'রে তুল্‌তে হ'বে; শত্রুমিত্রাদি ভেদ সব মনের মধ্যে; দ্বৈত দর্শনেই ভেদবুদ্ধি, একাত্মত্বে ভেদ কোথায়? ভেদবুদ্ধি আছে বলেই সংসার চল্‌ছে; ভেদবুদ্ধির নামই অবিদ্যা; ভেদবুদ্ধি নিবারণের নামই বিদ্যা; আতপ আছে বলেই ছায়ায় সুখানুভব হয়; অবিদ্যা আছে বলেই বিদ্যার আদর; গুণের খেলা গুণ খেল্‌ছে; ইন্দ্রিয় ইন্দ্রিয়ের খেলা খেল্‌ছে; তাতে আত্মার কি দোষ? সকলের মর্য্যাদা রক্ষা করাই বেদের উপদেশ; অন্যথা ধর্ম্মনাশ হ'বে। অতএব বেদপ্রদিষ্ট মার্গে বিচরণই শুভদায়ক। তুমি আত্মীয় স্বজনের সঙ্গ ছেড়ে বনে যেতে চাও; বনে গেলে বন্য পশুর সঙ্গে সঙ্গ ঘট্‌বে সুনিশ্চিত; পঞ্চ মহাভূত সর্ব্বত্র বিরাজিত; তাদের ত তুমি ছাড়্‌তে পার্‌বে না। যতক্ষণ পেট আছে, ততক্ষণ পেটের চিন্তা থাক্‌বেই। আহার চিন্তা যদি সদাই সঙ্গে রহিল, বনে গেলেও তুমি নিশ্চিন্ত হ'তে পার্‌ছ না। সন্ন্যাসী হলেও দণ্ডাজিনের চিন্তা আছে। সন্ন্যাসীর দণ্ডাজিনের চিন্তাও যেমন, সংসারীর সংসার চিন্তাও সেইরূপ। মুক্তিকামী হ'য়েও বিকল্প সন্দেহ জেগেছে বলেই না এত ভাব্‌ছ, বিচার কর্‌ছ! ওরে মা যে নির্ব্বিকার নির্ব্বিকল্প; তার কাছে সন্দেহ বিকল্প স্থান পায় না, তাঁর কোলে উঠে তোর এত ভয় ভাবনা কেন? তোর এত যুক্তি বিচারের দরকার কি? খাও দাও সুখে নিদ্রা যাও; "আমি বদ্ধ"—এ জ্ঞান ত্যাগ কর। "দেহাদি আমার"—এই ভাবটাই বন্ধন; এই ভাবটাকেই বলে সংসারী হওয়া। "আমার কিছুই নয়"—এই

ভাবটাই মুক্তি ; এই ভাবটাকেই বলে সংসারী সাজা! টাকা কড়ি বল, ধন জন বল, আমার কিছুই নয় ; দ্রব্য-দ্রবিণ, বাগান পুকুর বিষয় বৈভব আমার নয় ; পরের জিনিষ ; দু-দশ দিনের জন্য আমার কাছে গচ্ছিত আছে মাত্র ; দারা পুত্র পরিবার তারাও নয় আমার ; বন্ধু বান্ধব আত্মীয় স্বজন, কেউই আমার নয় ; কিছুই আমার নয়, অথচ সবই আমার। কি রকম জান ? গৃহস্থ বাড়ীর বিশ্বাসী চাকর যেমন। নিজের মতন করে সব জিনিষ নাড়্‌চে চাড়্‌চে, রাখ্‌ছে ঢাকৃছে, সবাইকে আদর যত্ন কর্‌ছে, ছোট ছোট ছেলে পিলেদের আপনার মত যত্ন আয়ত্তি কর্‌ছে, মনিবের জিনিষ নষ্ট না হয়, সেদিকে দৃষ্টি আছে, মনিবের ক্ষতি কর্‌লে তাকে বকৃছে ; অথচ সে মনে মনে জানে এ সব কিছুই তার নয়, এরা কেহই তার নয়। ঠিক এই ভাবটার নাম সংসারে সংসারী সাজা। সবই আমার অথচ কিছুই আমার নয়, সবাই আমার অথচ কেহই আমার নয়—এই ধারণা হৃদয়ে অনুভূতির ভিতর দিয়ে ফুটিয়ে তুল্‌তে হবে। তবে সংসারে সংসারী সাজা সম্ভব হবে।

দেহোঽহং মম বন্ধোঽহং ন মমেতি চ মুক্ততা।
তথা ধনং গৃহং রাজ্যং ন মমেতি চ নিশ্চয়ঃ।
ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ হরিঃ ওঁ।

বৈশাখ ১৬, ১৩৪৭

মহাবাক্য বিচার

ওয়ে মুক্তি-ইচ্ছু সাধক, মুক্তির formula মুখস্থ কর, চার বেদের চারিটি বাণী আছে ; সেই বাণী চারটি প্রথমে বোঝ, বুঝিয়া হৃদয়ফলকে তার অর্থ লিখিয়া রাখ ; এই বাণী চারিটিকে "মহাবাক্য" বলে। এই মহাবাক্য চতুষ্টয়ের সদা অনুধ্যানে, সদা মননে মুক্তির স্বরূপ ফুটে উঠে ; আত্মানুভূতি জাগিতে থাকে, মোক্ষ করামলকবৎ আয়ত্বে আসে।

১। ঋগ্‌বেদের মহাবাক্য হচ্চে—প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম। ঐতরেয় উপনিষৎ ঋগ্‌বেদের অন্তর্গত। সেই ঐতরেয় উপনিষদের সার কথা প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম। জগতের দৃশ্য বস্তুসকল যে চৈতন্য জ্যোতি দ্বারা দেখা যায়, তাহাকে প্রজ্ঞান বলে। যে চৈতন্য দ্বারা শব্দের শ্রবণ, গন্ধের আঘ্রাণ, বাক্য কথন এবং সুস্বাদ-বিস্বাদ বুঝিতে পারা যায়, সেই বুদ্ধিস্থ জীব চৈতন্যকে প্রজ্ঞান বলা হয়। ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরাদি দেবতাতে এবং মানুষ গরু ছাগল ভেড়া আদি জন্তুতে, সকলের মধ্যেই একমাত্র সর্ব্বব্যাপী পরব্রহ্ম অন্তর্যামীরূপে অবস্থান করেন, সুতরাং আমাতেও তিনি অবস্থিতি করিতেছেন ; অতএব একাধারস্থিত উভয় চৈতন্য অর্থাৎ প্রজ্ঞান ও ব্রহ্ম এ উভয়ই এক বস্তু ; উভয়ের মধ্যে অনৈক্য নাই ; উভয়ের মধ্যে ঐক্যই প্রতিপন্ন হইল ; সুতরাং প্রজ্ঞানই ব্রহ্ম—ইহা সিদ্ধ হইল। তাই শ্রুতি বলিয়াছেন,

যেনেক্ষতে শৃণোতীদং জিঘ্রতি ব্যাকরোতি চ
স্বাদ্বস্বাদু বিজানাতি তৎ প্রজ্ঞানমুদীরিতম্।
চতুর্মুখেন্দ্র দেবেষু মনুষ্যাশ্বগবাদিষু
চৈতন্যমেকং ব্রহ্মাতঃ প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম ময্যপি।

যিনি জীব হৃদয়ে বাস করিয়া চক্ষুকে দর্শন শক্তি দিয়াছেন, যিনি কর্ণকে শ্রবণ শক্তি দিয়াছেন বলিয়াই জীব শব্দ গ্রহণ করিতে পারে, যিনি নাসিকাকে আঘ্রাণ শক্তি দিয়াছেন বলিয়াই নাসিকা ঘ্রাণ গ্রহণে সমর্থ, যিনি জিহ্বাকে বাক্ শক্তি দিয়াছেন বলিয়াই জীব কথা বলিতে পারে ও স্বাদু অস্বাদু আস্বাদ বুঝিতে পারে, সেই জীব-হৃদয়স্থ চৈতন্যই প্রজ্ঞান নামে খ্যাত। ব্রহ্মাদি দেবতার মধ্যে ও মনুষ্যাদি জীব হৃদয়ে একই চৈতন্য বর্ত্তমান ; সুতরাং আমাতেও সেই চৈতন্যই খেলা করিতেছেন ; সুতরাং এক চৈতন্যের খেলাই দেব ও দেবেতর যোনিতে দেখা যাইতেছে। অতএব সিদ্ধ হইতেছে যে এই চৈতন্যই ব্রহ্ম, এই প্রজ্ঞানই ব্রহ্ম।

২। যজুর্ব্বেদের মহাবাক্য হচ্চে—অহং ব্রহ্মাস্মি। যজুর্ব্বেদের অন্তর্গত বৃহদারণ্যক উপনিষদে এই মহাবাক্য পাওয়া যায়। জীবদেহ পঞ্চভূতে গঠিত ; এই জীবদেহে পূর্ণজ্ঞানস্বরূপ পরমাত্মা অন্তঃকরণের সাক্ষীস্বরূপ বাস করেন। অন্তঃকরণ যাহা ভাবে, যে বৃত্তি অন্তঃকরণে উঠে, তিনি তাহা জানিতে পান,

তিনি তাহার সাক্ষী। এই শরীর উপলক্ষ্য করিয়া শমদমাদি সাধন সাহায্যে সংসারকে মায়াময় বলিয়া বুঝিতে পারা যায়। এই মায়িক সংসারে অন্তঃকরণের সাক্ষীস্বরূপ প্রকাশমান যে জীবচৈতন্য, তিনিই অহং শব্দ বাচ্য। আর স্বতঃ-সিদ্ধ সর্ব্বব্যাপী পরমাত্মাই ব্রহ্ম শব্দ বাচ্য। 'অস্মি' শব্দ দ্বারা 'অহং' শব্দ বাচ্য চৈতন্য ও ব্রহ্মচৈতন্য এই উভয় চৈতন্যের ঐক্য প্রতিপাদিত হইয়াছে। যখন অহং শব্দবাচ্য জীব চৈতন্য ও ব্রহ্ম-চৈতন্য এক বলিয়া সাব্যস্ত হইল, তখন জীবন্মুক্ত পুরুষের অহং ব্রহ্মাস্মি এই উক্তি শাস্ত্র-সিদ্ধান্ত ও সুসিদ্ধ বলিয়া জানিবে। তাই শ্রুতিমুখে শুনিতে পাই,—

পরিপূর্ণঃ পরাত্মাস্মিন্ দেহে বিদ্যাধিকারিণি।
বুদ্ধেঃ সাক্ষিতয়া স্থিত্বা স্ফুরন্নহমিতীর্য্যতে।
স্বতঃ পূর্ণঃ পরাত্মাত্র ব্রহ্ম শব্দেন বর্ণিতঃ
অস্মীত্যৈক্যপরামর্শ স্তেন ব্রহ্ম ভবাম্যহম্।

৩। সাম বেদের মহাবাক্য হচ্চে—তত্ত্বমসি। সামবেদের অন্তর্গত ছান্দোগ্য উপনিষদে এই মহাবাক্যটি পাওয়া যায়। এই প্রত্যক্ষ বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তির পূর্ব্বে কেবল একমাত্র নাম-রূপ-বর্জ্জিত সর্ব্বব্যাপী অদ্বিতীয় সৎস্বরূপ পরব্রহ্ম ছিলেন, এখনও তিনি তদ্রূপ আছেন, তিনিই 'তৎ' শব্দের বাচ্য। জীব সকলের দেহেন্দ্রিয়াদি হইতে ভিন্ন যে অন্তঃকরণস্থিত চৈতন্য, তিনি 'ত্বং' শব্দের বাচ্য। অসি শব্দ দ্বারা তৎ ও ত্বং এই দুই পদের ঐক্য প্রতিপাদিত হইয়াছে। সুতরাং জীব-চৈতন্য ও পরব্রহ্মের ঐক্য অনুভব করা মুমুক্ষুর একান্ত কর্ত্তব্য। তাই শ্রুতিতে দেখিতে পাই,—

একমেবাদ্বিতীয়ং যৎ নামরূপ বিবর্জ্জিতম্
সৃষ্টেঃ পুরাধুনাপ্যস্য তাদৃক্ ত্বং তদিতীর্য্যতে।
শ্রোতুর্দেহেন্দ্রিয়াতীতং বস্ত্বত্র ত্বং পদেরিতম্
একতা গৃহ্যতেঽসীতি তদৈক্যমনুভূয়তাম্।

৪। অথর্ব্ববেদের মহাবাক্য হচ্চে—অয়মাত্মা ব্রহ্ম। স্বয়ং প্রকাশ-স্বরূপ অপরোক্ষ জীব চৈতন্য 'অয়ং' শব্দের বাচ্য। আর সেই জীব চৈতন্যই দেহেন্দ্রিয় মন বুদ্ধি অহঙ্কারের মধ্যে বর্ত্তমান থাকায় তিনিই আত্মা শব্দে কথিত হন। সুতরাং অয়ং ও আত্মা এই উভয় শব্দ দ্বারাই জীব চৈতন্য বুঝাইতেছে।

এই সকল দৃশ্যমান্ বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের মূলাধার এক কারণ স্বরূপ পরব্রহ্ম চৈতন্য 'ব্রহ্ম' শব্দের বাচ্য। তিনিই স্বয়ং প্রকাশস্বরূপ। অতএব জীব ও ব্রহ্ম উভয়ের ঐক্য প্রতিপাদিত হইল। তাই. শ্রুতি বলিতেছেন,—

স্বপ্রকাশাপরোক্ষত্বময়মিত্যুক্তিতো মতম্
অহঙ্কারাদিদেহান্তাৎ প্রত্যগাত্মেতি গীয়তে।
দৃশ্যমানস্য সর্ব্বস্য জগতস্তত্ত্বমীর্য্যতে
ব্রহ্ম শব্দেন তদ্‌ব্রহ্ম স্বপ্রকাশাত্মরূপকম্।

আষাঢ় ৭, ১৩৪৭।

পঞ্চকোষের বিচার

সংসারের জ্বালামালা থেকে অব্যাহতি লাভের জন্য ভগবানের আশ্রয় নিতে হয়, ভগবানকে জান্‌তে হয়, ব্রহ্মকে অনুভবে ফুটিয়ে তুল্‌তে হয়। ভগবান্, পরমাত্মা, ব্রহ্ম এগুলি একজনেরই ভিন্ন ভিন্ন নাম মাত্র। ভগবান্ এই দেহে বাস করেন। ঐতিরিয় উপনিষৎ বলিয়াছেন যে ব্রহ্ম এই দেহে গুহার মধ্যে বাস করেন। পঞ্চকোষকে গুহা বলে। অন্নময়-কোষ, প্রাণময় কোষ, মনোময়-কোষ, বিজ্ঞানময় কোষ ও আনন্দময়-কোষ,—এই পঞ্চকোষ। কোষ মানে খাপ, যেমন তরবারির খাপ। প্রথম কোষটি স্থূল অন্নময়; অন্নময়-কোষের অভ্যন্তরে প্রাণময়-কোষ অন্নময়-কোষ অপেক্ষা সূক্ষ্ম; প্রাণময় কোষের অভ্যন্তরে মনোময় কোষটি প্রাণময় কোষ অপেক্ষা সূক্ষ্ম; মনোময় কোষের অভ্যন্তরে বিজ্ঞানময় কোষ; বিজ্ঞানময় কোষ মনোময় কোষের অপেক্ষা সূক্ষ্ম; বিজ্ঞানময় কোষের অভ্যন্তরে আনন্দময় কোষ; আনন্দময় কোষটি বিজ্ঞানময় কোষ অপেক্ষা সূক্ষ্ম। ৭০০ রাক্ষসীর গল্প স্মরণ কর তাদের প্রাণ ভোমরা-ভোমরীরূপে পাঁচটা কৌটার মধ্যে ছিল; প্রথমে লোহার বাক্স, তার ভিতর কাঠের বাক্স, তার ভিতর রূপার কৌটা, তার ভিতর সোণার কৌটা, তার ভিতর মহামূল্য রত্নখচিত কৌটা, তার ভিতর ভ্রমর-

ভ্রমরী; ৭০০ রাক্ষসীর প্রাণ। ব্রহ্মও তেমনি জীবদেহে পঞ্চকোষের মধ্যে আবদ্ধ। পঞ্চকোষের জ্ঞান ফুটিয়ে তুল্‌তে পার্‌লে ব্রহ্মস্বরূপ সাধক চিত্তে বেশ ফুটে উঠে; তাই পঞ্চকোষের বিচার দরকার। পঞ্চকোষের স্বরূপ বু'ঝতে হ'বে।

আমরা যে আহার করি, সেই উদরস্থ খাদ্যের সারভাগ হইতে প্রথমে রস উৎপন্ন হয়, রসের সারভাগ হইতে রক্ত, রক্তের সারভাগ হইতে মাংস, মাংসের সারভাগ হইতে স্নায়ু, স্নায়ুর সারভাগ হইতে অস্থি, অস্থির সারভাগ হইতে মজ্জা, মজ্জার সারভাগ হইতে শুক্র উৎপন্ন হয়। পিতৃ-মাতৃভুক্ত অন্নাদির পরিণাম হচ্চে শুক্র-শোণিত। এই শুক্র-শোণিত যোগে উৎপন্ন হয় আমাদের এই স্থূল দেহ। এই স্থূল দেহ অন্নরস দ্বারা পরিবর্দ্ধিত হয়। এই অন্নদ্বারা প্রবর্দ্ধিত স্থূল দেহই অন্নময় কোষ। এই অন্নময় কোষকে ব্রহ্ম বা আত্মা বলিয়া স্বীকার করা যায় না; কেননা, জীবের উৎপত্তির পূর্ব্বে অন্নময় কোষ ছিল না, এবং মরণের পরেও অন্নময় কোষ থাকে না; কিন্তু আত্মা অবিনাশী, জীবের আত্মা জন্মগ্রহণের পূর্ব্বেও ছিল, মরণের পরেও থাকে। যদি বল, যে উৎপত্তি বিনাশশীল স্থূলদেহকেই আত্মা বলিলে দোষ কি? না তা বলিতে পার না; গত জীবনের কর্ম্মফল ভোগ করিবার জন্যই এ জন্মে এই দেহ পেয়েছ; গত জীবনের দেহ ফেলে দিয়ে এসেছ; কেননা, গত জীবনের দেহ দ্বারা এ জন্মের প্রারব্ধ ভোগ হ'তে পারে না। আবার ইহজন্মের দেহ দ্বারা ভাবী জন্মের কর্ম্মফল ভোগ হ'তে পারে না; ভাবীজন্মে শিয়াল হবে, কি দেবদেহ হবে, তার ঠিক কি? এ জন্মে যেমন কাজ করা হ'বে, ভাবীজন্মের দেহ সেই কাজ অনুযায়ী হবে। সুতরাং যে দেহ পরিণামী, সে দেহ কখন অপরিণামী আত্মা হ'তে পারে না। অতএব স্থূলদেহের বা অন্নময় কোষের অনাত্মত্ব (আত্মা নয়) প্রতিপন্ন হইল।

প্রাণ, অপান, ব্যান, উদান, সমান এই পঞ্চবায়ুকে পঞ্চপ্রাণ বলে। এই পঞ্চপ্রাণকে প্রাণময় কোষ বলে; পঞ্চপ্রাণই ইন্দ্রিয়দিগকে কার্য্যে প্রবৃত্তি দেয়। অন্নাদি আহারে ইন্দ্রিয়াদি সমেত এই পঞ্চপ্রাণ বলশালী হয়; অন্ন আহার ত্যাগ করিলে তাহারা ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া আসে; একেবারে অন্ন ত্যাগ করিলে পঞ্চপ্রাণের নাশ হয়। অন্ন জড় বস্তু; অন্নের উপর নির্ভরশীল

এই পঞ্চপ্রাণও জড় বস্তু। ধ্বংসশীল জড় বস্তু কখন অবিনাশী আত্মা হইতে পারে না; সুতরাং প্রাণময় কোষও আত্মা নহে।

স্থূলদেহে "আমি" বোধ এবং পুত্রদারাগৃহ ও ধনাদিতে "আমার, আমার" জ্ঞান মনের স্বরূপ। ভ্রমবশতঃ দেহে "আমি" জ্ঞান বা বিষয়ে "আনার" জ্ঞান মনের স্বরূপ। ভ্রমবশতঃ দেহে "আমি" জ্ঞান বা বিষয়ে "আমার" জ্ঞান ঘটে থাকে। কাম, ক্রোধাদি বৃত্তিদ্বারা মন বিকারগ্রস্ত হয়; কিন্তু আত্মা নির্ব্বিকার; সুতরাং মন আত্মা নহে; এইরূপে মনের অনাত্মত্ব নিরূপিত হইল।

বুদ্ধি চৈতন্যছায়া বিশিষ্ট; বুদ্ধিই বিজ্ঞানময় কোষ; জাগ্রতকালে নখাগ্র হইতে সারা দেহ ব্যাপিয়া বুদ্ধি অবস্থিতি করে; সুষুপ্তিকালে অজ্ঞানে লীন হয়; সুতরাং বুদ্ধির উৎপত্তি ও আছে, লয়ও আছে; লয়োৎপত্তি বিশিষ্ট বুদ্ধি কখনও আত্মা হইতে পারে না; কেননা, আত্মা লয়োৎপত্তি-বিহীন। বুদ্ধি নিশ্চয়াত্মিকা; তাই জীবদেহে বুদ্ধির কর্ত্তৃত্ব স্বীকার করিতে হয় এবং সেইজন্য বুদ্ধি বিজ্ঞানময় শব্দের বাচ্য।

পুণ্যকর্ম্মের ফলভোগ সময়ে একটা আনন্দের অনুভূতি জাগে। এই আনন্দকে আনন্দময় কোষ বলে। সেই আনন্দটা চিদানন্দের প্রতিবিম্ব; চিরকাল থাকে না; ভোগ শেষ হলে সেই আনন্দ ভাবটা লয় পায়, প্রকৃতিতে লয় হয়। সুতরাং উৎপত্তি-লয়শীল আনন্দময় কোষকে আত্মা বলা যায় না; ক্ষণবিধ্বংসী কেমন করিয়া আত্মা হইবে, আত্মা যে অবিনাশী। এই আনন্দময় কোষ অপেক্ষাও সূক্ষ্ম নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত সৎস্বরূপ চিদানন্দই আত্মা শব্দের বাচ্য।

বেশ কথা। স্থূলদেহ হইতে আনন্দময় কোষ পর্য্যন্ত এ সবই না হয় অনাত্ম বস্তু হইল; স্থূলদেহ হইতে আনন্দময় কোষ পর্য্যন্ত সকলে অনুভব করিতে পারে; কিন্তু তদতিরিক্ত বস্তু ত আর অনুভবে আসে না; সুতরাং অনুভবাতিরিক্ত বস্তু স্বীকার করিতে যাই কেন? আত্মাকে অনুভব করিতে পারি না যখন, তখন আত্মাকে স্বীকার করিব কেন? ইহার উত্তর হচ্ছে, যে চৈতন্য দ্বারা স্থূলদেহাদি অনুভব কর, সেই চৈতন্যই আত্মা। ইহা স্বীকার করিতেই হইবে।

পঞ্চ-কোষাতিরিক্ত নিত্য জ্ঞানস্বরূপ আত্মা অজ্ঞেয় কেন? তিনি

উপলভ্যমান হন না কেন? ইহার সিদ্ধান্ত হচ্ছে যে, পরমাত্মা স্বয়ং জ্ঞানস্বরূপ; তিনি জ্ঞেয় স্বরূপ নহেন। জ্ঞাতা ও অন্য জ্ঞানের অভাবহেতু তিনি অজ্ঞেয়; তিনি নাই বলিয়া,—তাঁহার সত্তা নাই বলিয়া তিনি অজ্ঞেয় নন। মধু যার সঙ্গে মিশে, তাকেই মধুময় করে, সুমিষ্ট আস্বাদযুক্ত করে; মধুকে মিষ্ট করিবার জন্য অন্য মধুরাদিগুণ বিশিষ্ট বস্তুর দরকার হয় না; মধুর মাধুর্য্যাদি গুণ স্বতঃসিদ্ধ। সেইরূপ, জ্ঞাতা ও জ্ঞানান্তর না থাকায় আত্মা অজ্ঞেয় হইলেও তিনি যে নিত্য জ্ঞানস্বরূপ ইহা স্বতঃসিদ্ধ। আত্মা স্বয়ং প্রকাশ স্বরূপ, তিনি জ্যোতির্জ্যোতি প্রত্যগ্ জ্যোতিঃ, তিনি অন্তর্জ্যোতি বহির্জ্যোতিঃ, তিনি স্বয়ং জ্যোতিঃ; এই অখিল জগত উৎপত্তির পূর্ব্বে ও তিনি ছিলেন; এই জগৎ ব্রহ্মাণ্ড তাঁহার প্রকাশের অনুগামী; তদ্ভাসা ভাসতে জগৎ—তাঁহার প্রকাশ দ্বারা সমুদয় প্রকাশিত হয়। ইন্দ্রিয়গুলি জ্ঞেয় বস্তু প্রকাশ করিতে পারে; পরমাত্মা ত আর জ্ঞেয় বস্তু নন; কাজেই ইন্দ্রিয় সাহায্যে তাঁহাকে জানা যায় না। পরমাত্মা সকলকে জানিতেছেন; তিনি সকলের জ্ঞাতা; তাঁহাকে কেহ জানিতে পারে না; যে সাধক যখন তাঁকে জানিতে পারে, তখন সে পরমাত্মা হইয়া যায়, ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্ম ভবতি, তখন আর সে সাধকরূপে থাকে না। চৈতন্য দ্বারা সকলকে জানা যায়; কিন্তু অন্য কিছু দ্বারা চৈতন্যকে জানিবার উপায় নাই। যত কিছু জ্ঞেয় পদার্থ জগতে আছে, তাহাদের সকলকে পরমাত্মা জানেন, কিন্তু তাঁহাকে কেহ জানিতে পারে না; তিনি বিদিত অবিদিত উভয় পদার্থ হইতে ভিন্ন; তিনি নিত্যসিদ্ধ জ্ঞানস্বরূপ পরমেশ্বর। স বেত্তি বেদ্যং তৎ সর্ব্বং নান্যস্তস্যাস্তি বেদিতা।

জ্ঞান মানে জানা; পরমাত্মা বোধস্বরূপ; তোমার অল্পাধিক জ্ঞান আছে; জ্ঞান অনুভব করিতেছ; সুতরাং বোধস্বরূপ পরমাত্মা বোধগম্য হইতেছে। নিত্য বোধস্বরূপ পরমাত্মা আমার বোধগম্য হইতেছে না—ইহা বলা যুক্তি সঙ্গত নহে; যেমন আমার জিহ্বা আছে কি নাই,—ইহা বলা অত্যন্ত লজ্জাকর; কেননা জিহ্বা ব্যতীত কথা কহা যায় না; আমি যখন কথা কহিতেছি, তখন জিহ্বার অস্তিত্ব জ্ঞান আমার নিশ্চয় আছে; সেইরূপ, আমার যখন বোধ আছে, তখন বোধস্বরূপ পরমাত্মা আমার নিশ্চয়ই বোধগম্য হইতেছে,—ইহা অস্বীকার করা লজ্জাকর অযুক্তি।

জগতে যে যে বস্তু আমাদের বোধে আসে, বস্তুগুলিকে ত্যাগ করিয়া থালি সেই সেই বস্তু বিষয়ক যে জ্ঞান তাহাকেই ব্রহ্ম বলিয়া জ্ঞান; সেই জ্ঞানকেই ব্রহ্মজ্ঞান বলে। জ্ঞান ব্যতীত আর কোন পদার্থ তাঁহার স্বরূপ নহে। বিবেচনা করিয়া বিচার করিয়া পঞ্চকোষ ত্যাগ করিলে অবশিষ্ট সাক্ষীস্বরূপ যে জ্ঞান, তাহাই পরব্রহ্মের স্বরূপ। আমি আছি এটা সকলেই মানে; আমি আপনি আছি কি না আছি,—এ বিষয় কেহই সন্দেহ করে না, আপনার সত্তাসত্ত্ব সম্বন্ধে কেহই বিবাদ করে না—এই যে জ্ঞান, এই যে স্বয়ং সম্বন্ধে জ্ঞান, ইহাকেই স্বয়ং জ্যোতিঃ বলে, ইহাকেই আত্মচৈতন্য বলে।

যদি কেহ পরব্রহ্মকে অসৎ বলে মনে করে, তা' হ'লে তার নিজ সত্তাকেও অসৎ বলে মনে করতে হয়; কেননা, জীব-চৈতন্যই পরব্রহ্মের স্বরূপ। আপন সত্তাকে যেমন কথনও অস্বীকার কর না, সুতরাং আত্মচৈতন্যকে—জীব-চৈতন্যকেও কথন অস্বীকার করিতে পার না; কাজেই পরমাত্মাকে স্বীকার করিতেই হয়।

চোখে যে সকল বস্তু দেখা যায়, তাহাদের ঈদৃশ বলা হয়; যা' চোখে দেখতে পাওয়া যায় না, তা'কে তাদৃশ বলা হয়; অপ্রত্যক্ষ বস্তুই তাদৃশ; কিন্তু পরমাত্মা জ্ঞানস্বরূপ, চক্ষুর বিষয় নহেন এবং অপ্রত্যক্ষও নহেন; তিনি নিত্য প্রত্যক্ষ স্বয়ং প্রকাশ চৈতন্যস্বরূপ। পরমাত্মা যে অবেদ্য অজ্ঞেয় হইয়াও নিত্য প্রত্যক্ষ, ইহা পূর্ব্বে সর্ব্বপ্রকার যুক্তি দ্বারা সুসিদ্ধ হইয়াছে। সেই সকল যুক্তি প্রয়োগে আত্মা যে স্বয়ং প্রকাশ, তা'ও প্রমাণ করা যায়। আর শ্রুতিও বলিয়াছেন, ব্রহ্ম সত্য, জ্ঞান ও অনন্তস্বরূপ—ইহারাই ব্রহ্মের লক্ষণ—সত্যং জ্ঞানমনন্তঞ্চেত্যস্তীহ ব্রহ্মলক্ষণম্। যাহার কথন ধ্বংস হয় না, তাহাকে সত্য বলে; অবিনাশী বস্তুই সত্য বস্তু। মানুষ ধ্বংস হলেও, তাহার মধ্যস্থ সাক্ষী-স্বরূপ যে পরমাত্মা থাকেন, তাহার ধ্বংস হয় না; তিনি জ্ঞানস্বরূপ, সদাস্থায়ী বস্তু; জগতের প্রত্যেক বস্তু ধ্বংস হ'লেও সেই বস্তুর অন্তর্গত অন্তর্যামী কথনও ধ্বংস হন না; জগতের নাশে পরমাত্মার নাশ নাই; তিনি যে জগতের প্রাণ, উহার সাক্ষীস্বরূপ; নিত্য জ্ঞানরূপে চির বিদ্যমান। যেমন মূর্ত্তিমান পদার্থসকল বিনষ্ট হলে কেবল আকাশ অবশিষ্ট থাকে, সেইরূপ আকাশাদি পদার্থসকল ধ্বংস হইলে জ্ঞানমাত্র অবশিষ্ট থাকে; তিনিই পরমাত্মা। সেই অবশিষ্ট জ্ঞানই পরব্রহ্ম।

যদি বল প্রত্যক্ষ সমস্ত বস্তু নষ্ট হইলে আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না; অতএব নাশাবশিষ্ট বস্তুকে কিরূপে পরমাত্মা বলা যায়? এই প্রশ্নের সিদ্ধান্ত এই,—তুমি যাহাকে "কিছুই অবশিষ্ট থাকে না" বল, সেই অলক্ষ্য অনির্দ্দেশ্য বস্তুকে আমি পরমাত্মা বলি; অতএব তোমার ও আমার কেবল ভাষামাত্র ভিন্ন; নতুবা জগৎনাশাবশিষ্ট অনির্দ্দেশ্য অলক্ষ্য একমাত্র বস্তু উভয়ের পক্ষেই সমান। আর এক কথা, বেদের কথা ত মেনে চলতে হবে; বেদ বলেছেন, সাক্ষী চৈতন্যের কখন অভাব হয় না; প্রত্যক্ষ পদার্থ সকল হইতে পরমাত্মা ভিন্ন পদার্থ; প্রত্যক্ষ পদার্থ সকলের ধ্বংস হইবার পর যিনি অবশিষ্ট থাকেন; তিনিই সাক্ষী চৈতন্য পরমাত্মা; এটা শ্রুতির কথা, মানিতেই হবে। তা'হলে প্রমাণ হ'ল, যে পরমাত্মা সত্য বস্তু ও নিত্য অবস্থিত; অর্থাৎ তিনি সত্য ও নিত্য। তিনি সর্ব্বব্যাপী; কাজেই দেশ তাঁহাকে বিচ্ছিন্ন করিতে পারে না। তিনি নিত্য, সুতরাং কাল তাঁহাকে পরিচ্ছিন্ন করিতে পারে না। সর্ব্ব বস্তুর আত্মাস্বরূপ হওয়ায় কোন বস্তু পরমাত্মাকে বিচ্ছিন্ন করিতে পারে না। অতএব তিনি দেশ-কাল-বস্তুবর্জ্জিত অনন্ত-স্বরূপ। আরও দেখ, দেশ, কাল বা বস্তুসকল মায়া-জড়িত; পরমাত্মা মায়াতীত; কাজেই মায়াকল্পিত দেশ কাল বা বস্তু দ্বারা তাঁহার পরিচ্ছেদ অসম্ভব। তারপর জড় বস্তু দ্বারাও তাহার পরিচ্ছেদ হওয়া সম্ভব নয়; জড় বস্তু বা জীব বা ঈশ্বর মায়াকল্পিত; জীবের দেহাদি অঙ্গগুলি জড়; সুতরাং জীবের বা ঈশ্বরের দেহাদি দ্বারা সত্য-জ্ঞান-অনন্তস্বরূপ পরব্রহ্ম পরিচ্ছিন্ন হইতে পারেন না; জীব বা ঈশ্বরের যে চৈতন্য তাহা ব্রহ্মচৈতন্য হইতে ভিন্ন নহে।

পরব্রহ্মের কোন শক্তি (আনন্দ ইত্যাদি) সকল বস্তুর মধ্যে নিগূঢ়ভাবে ব্যাপ্ত রহিয়াছে; সেই শক্তি দ্বারা জগৎ—বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড নিয়ন্ত্রিত বা নিয়মবদ্ধ; যদি নিয়মবদ্ধ না হ'ত, জগতের মধ্যে সুশৃঙ্খলা থাকিত না; জগতের ভিন্ন ভিন্ন বস্তুর ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মের সঙ্ঘাতে বিশৃঙ্খলা বা বিপ্লব উপস্থিত হইত। নিত্য চৈতন্য পরব্রহ্মের সেই শক্তি তাঁহারই অধিষ্ঠানবশতঃ চেতনবৎ হন; অতএব সেই শক্তির জগৎ শৃঙ্খলা বজায় রাখিবার কর্ত্তৃত্ব থাকা সম্ভব। সেই শক্তি-যোগে স্বয়ং পরব্রহ্ম ঈশ্বর নামে পরিচিত হন; ব্রহ্মচৈতন্য যখন নিরুপাধিক, তখন তাঁকে পরব্রহ্ম বলা হয়; এবং যখন মায়াশক্তিরূপ উপাধিবিশিষ্ট, তখন

তিনি ঈশ্বর নামে পরিচিত হন ; আবার সেই পরব্রহ্ম চৈতন্য যখন পঞ্চকোষরূপ উপাধিবিশিষ্ট হন, তখন তাঁর নাম হয় জীব। একই ব্যক্তি যেমন পুত্রকে অবলম্বন করিয়া পিতা শব্দে পরিচিত, এবং পৌত্রকে অবলম্বন করিয়া পিতামহ নাম ধারণ করে, সেইরূপ একই ব্রহ্মচৈতন্য মায়া অবলম্বনে ঈশ্বর ও পঞ্চকোষ অবলম্বনে জীব নাম ধারণ করেন। পুত্র বা পৌত্রের অভাবে সেই ব্যক্তি যেমন পিতা বা পিতামহ নাম বর্জ্জিত হন, কিন্তু তাঁহার ব্যক্তিত্ব ঠিক একই রকম থাকে, সেইরূপ মায়া বা পঞ্চকোষ উপাধিবর্জ্জিত হ'লে, তিনি ঈশ্বর বা জীব নামে আর পরিচিত হন না ; কিন্তু তাঁর স্বরূপ পূর্ব্বমত ঠিক থাকে, তখন সত্য জ্ঞান অনন্তরূপেই তিনি প্রকাশ পান।

এইরূপে পঞ্চকোষ বিচার করিয়া যে সাধক পরব্রহ্মকে জানিতে, বুঝিতে, উপলব্ধি করিতে পারেন, তিনি ব্রহ্মানন্দ লাভ করেন এবং দেহান্তে আর পুনর্জ্জন্ম হয় না—তাঁকে আর জননমরণরূপ সংসারে জ্বালামালা ভোগ করিতে আসিতে হয় না, তিনি মরণহীন দেশে যাইয়া চিরমুক্তাবস্থা প্রাপ্ত হন ; তাই শ্রুতি মুখে শুনিতে পাই—

য এবং ব্রহ্ম বেদৈষ ব্রহ্মৈব ভবতি স্বয়ম্
ব্রহ্মণো নাস্তি জন্মাতঃ পুনরেব ন জায়তে।
ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ হরিঃ ওঁ।

আষাঢ় ৮, ১৩৪৭।

দ্বৈতভাবের বিচার

ওরে দ্বৈত জ্ঞানকে হেয় মনে করিস্ না ; দ্বৈত আছে বলিয়াই অদ্বৈতের মান ; অন্ধকার আছে ব'লেই আলোর আদর ; অমাবস্যা আছে ব'লেই পূর্ণিমার কদর ; মূর্খ আছে ব'লেই বিদ্বানের মান ; মায়া আছে ব'লেই মায়া-বর্জ্জিতের দিকে টান। মায়াকে ভাল ক'রে চিন্‌তে পার্‌লে মায়াধীশকে চেন্‌বার সুবিধা হয়, মায়াকে ভাল ক'রে বুঝ্‌তে পার্‌লেই মায়াবর্জ্জিতের সন্ধান মেলে।

দ্বৈতের বিচার দরকার ; দ্বৈতজগতের বিচার বিবেচনায় কোন্‌গুলি জীবের পরিত্যজ্য সে জ্ঞানটা বেশ ফুটে ওঠে। ঈশ্বরের সৃষ্টি ও জীবের কল্পনা লইয়াই জগত গ'ড়ে উঠেছে।

মায়াশক্তিকে প্রকৃতি বলে। মায়ারূপ উপাধিবিশিষ্ট চৈতন্যকে ঈশ্বর বলে। এই মায়া-উপাধিবিশিষ্ট ঈশ্বর বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি ক'রেছেন ; শ্বেতাশ্বতর উপনিষৎ বলিতেছেন,

মায়ান্তু প্রকৃতিং বিদ্যাৎ মায়িনন্তু মহেশ্বরম্।
স মায়ী সৃজতীত্যাহুঃ শ্বেতাশ্বতর-শাখিনঃ ॥

ঐতরেয় উপনিষৎ বলিতেছেন, আত্মা বা ইদমেকম্ এবাগ্র আসীৎ ন অন্যৎ কিঞ্চনমিষৎ, পরমাত্মাই অগ্রে—সৃষ্টির আদিতে একমাত্র ছিলেন ; তিনি সঙ্কল্প করিলেন, যে আমি জগৎ সৃষ্টি করিব, সেই সঙ্কল্পমাত্রে এই সমস্ত জগৎ, চতুর্দ্দশ ভুবন সৃষ্ট হইল। সেই পরমাত্মা হইতে আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল, পৃথিবী, ওষধি, অন্ন এবং দেহ এই সকল উৎপন্ন হইয়াছে। "আমি প্রজাসকল সৃষ্টি করিয়া বহু শরীরে ব্যাপ্ত হইব"—এই প্রকার সঙ্কল্পরূপ তপস্যা দ্বারা ঈশ্বর সমুদয় জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন।

আত্মা বা ইদমগ্রেঽভূৎ স ঐক্ষত সৃজা ইতি
সঙ্কল্পেনাসৃজল্লোকান্ স এতানিতি বহ্বৃচাঃ।
খ বাযুগ্নি-জলোর্ব্যোষধ্যন্নদেহাঃ ক্রমাদমী
সম্ভূতা ব্রহ্মণস্তস্মাদেতস্মাদাত্মনোঽখিলাঃ।
বহুস্যামহমেবাতঃ প্রজায়েয়েতি কামতঃ
তপস্তপ্ত্বাসৃজৎ সর্ব্বং জগদিত্যাহ তৈত্তিরিঃ ॥

সামবেদীয় ছান্দোগ্য উপনিষদে স্পষ্ট উক্ত আছে যে, এই জগৎ উৎপত্তির পূর্ব্বে কেবল সৎ মাত্র ছিলেন, তিনি সঙ্কল্প করিলেন যে, বিবিধ প্রকার জগৎ উৎপন্ন হউক, তাহাতে সেই সঙ্কল্পমাত্রে অগ্নি, জল, অন্ন ও বিবিধপ্রকার জীব সকল উৎপন্ন হইল। যথা,—

ইদমগ্রে সদেবাসীদ্ বহুত্বায় তদৈক্ষত
তেজোঽবন্না ওজাদীনি সসর্জেতি চ সামগাঃ।

অথর্ব্ববেদীয় মুণ্ডক উপনিষদে প্রতিপাদিত হইয়াছে যে, যেমন অগ্নি হইতে

স্ফুলিঙ্গ অর্থাৎ কণাসকল উৎপন্ন হয়, তদ্রূপ অক্ষর পরমেশ্বর হইতে বিবিধ প্রকার চেতন জীব ও নানাবিধ জড় পদার্থসকল উৎপন্ন হইয়াছে। যথা—

বিস্ফুলিঙ্গা যথা বহ্নে র্জায়ন্তেঽক্ষরতস্তথা
বিবিধাশ্চিজ্জড়া ভাবা ইত্যাথর্ব্বনিকী শ্রুতিঃ।

যজুর্ব্বেদীয় বৃহদারণ্যক শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে যে, পূর্ব্বে এই জগৎ অব্যাকৃতরূপে ছিল, এক্ষণে বিরাট্ প্রভৃতির নাম ও রূপ দ্বারা চেতনাচেতন নানা দৃশ্য পদার্থরূপে সুস্পষ্ট ব্যাকৃত হইয়াছে অর্থাৎ বিরাট্, মনু, নর, গো, অশ্ব, গর্দ্দভ, অজ, মেষ এবং পিপীলিকাদি দ্বন্দ্বরূপে ব্যক্ত হইয়াছে। তদ্ যথা—

জগদব্যাকৃতং পূর্ব্বমাসীদ্ ব্যাক্রিয়তেঽধুনা
দৃশ্যাভ্যাং নামরূপাভ্যাং বিরাড়াদিষু তে স্ফুটাঃ।
বিরাণ্মনুর্ন্নরা গাবঃ খরাশ্বাজা বয়স্তথা
পিপীলিকাবধি দ্বন্দ্বমিতি বাজসনেয়িনঃ।
কৃত্বা রূপান্তরং জৈবং দেহে প্রাবিশদীশ্বরঃ
ইতি তাঃ শ্রুতয়ঃ প্রাহুর্জীবত্বং প্রাণধারণাৎ।

এই সকল বেদ বাক্য হইতে দ্বৈত সৃষ্টি কিরূপে ঘটিয়াছিল, তাহাই প্রমাণ হইল। পূর্ব্বোক্ত সকল শ্রুতি বচনের তাৎপর্য্য এই যে, পরমেশ্বর জীবচৈতন্য রূপে সমুদয় প্রাণিদেহে প্রবিষ্ট হইয়াছেন। যেহেতু, তিনি জীবদেহে প্রবিষ্ট হইয়া প্রাণধারণ করিতেছেন, সেইজন্য তিনি জীব নামে পরিচিত। ব্রহ্ম সর্ব্বব্যাপী; সকল অধিষ্ঠান তাঁহাতেই অধিষ্ঠিত; তিনি চৈতন্যরূপে সকল অধিষ্ঠানে বর্ত্তমান; পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ প্রাণ, মন ও বুদ্ধি ইহাদিগের সমষ্টির নাম লিঙ্গ শরীর। এই লিঙ্গ-দেহ ও লিঙ্গ-দেহস্থিত চৈতন্য প্রতিবিম্ব ইহাদের যোগে জীবের উৎপত্তি। সর্ব্বব্যাপী ব্রহ্মচৈতন্য, ইন্দ্রিয়, মন, প্রাণ ও বুদ্ধি নির্ম্মিত লিঙ্গদেহ ও লিঙ্গদেহস্থ চৈতন্যছায়া ইহাদের সমষ্টির নাম জীব। তবেই দেখ, সর্ব্বব্যাপী পরব্রহ্মচৈতন্যই জীবদেহে প্রবেশ করিয়া জীব শব্দে পরিচিত; পরব্রহ্মই যদি জীব হইল, তবে তার সুখদুঃখ ভোগ হয় না। মায়া ব্রহ্ম শক্তি। ব্রহ্ম মায়াশক্তি বলেই জীবরূপ ধারণ করেন; মায়ার যেমন জগৎসৃজনসামর্থ্য আছে, তাহার তেমনি মোহিনী শক্তিও আছে; এই মোহিনী শক্তি দ্বারা জীব মুগ্ধ হইয়া সাংসারিক সুখদুঃখ প্রাপ্ত হয়। মোহ

দ্বারা ঈশ্বরত্ব ভুলিয়া যায়, আত্মস্বরূপের বিস্মৃতি ঘটে ; বিস্মৃতির ফলে সংসারে নিমগ্ন হইয়া জীব শোকাকুল হয়। অতএব দেখা যাইতেছে, ঈশ্বরই দ্বৈত বস্তুগুলির সৃষ্টিকর্ত্তা। আবার জীবও কতকগুলি দ্বৈত বস্তু সৃষ্টি করিয়াছে ; জীবেরা জ্ঞান দ্বারা সাত প্রকার অন্ন সৃষ্টি করিয়াছে ; সাধারণ মর্ত্ত্য জীবের জন্য এক অন্ন, দেবতাদিগের জন্য দুই প্রকার অন্ন, পশুদিগের জন্য এক প্রকার অন্ন, এবং আত্মার জন্য তিন প্রকার অন্ন। সাধারণ মর্ত্ত্যজীবের জন্য শস্যাদি হচ্চে অন্ন; দর্শ ও পৌর্ণমাস যজ্ঞ,—এই দুটি দেবতাদিগের অন্ন ; দুগ্ধ পশুদিগের অন্ন ; মন, বাক্য ও প্রাণ এই তিনটি আত্মার অন্ন। এইগুলি ঈশ্বর সৃষ্টি করিয়াছেন এবং জীবেরা ভোগ্যরূপে স্বীকার করিয়াছে। জীব ভোগ্যরূপে স্বীকার করিয়াছে বলিয়াই ইহাদের জীবসৃষ্ট বলা হয়। যেমন স্ত্রীজাতি পিতা কর্ত্তৃক উৎপন্ন হইলেও পিতার ভোগ্য নহে, স্বামীর ভোগ্য ; সেইরূপ সাত প্রকার অন্ন ঈশ্বর কর্ত্তৃক সৃষ্ট হইলেও ঈশ্বরের ভোগ্য নহে, জীবের ভোগ্য। ঈশ্বর সৃষ্ট পদার্থ এক প্রকার ; কিন্তু সেই সৃষ্ট বস্তুর ভোগ নানা প্রকার হ'তে পারে। ঈশ্বর মণি সৃষ্টি করিয়াছেন ; সেই মণি লাভ করিয়া কেহ হর্ষ বোধ করে, সেই মণি লাভে অসমর্থ হইয়া কেহ ক্রুদ্ধ হয়, আবার কেহ সেই মণি দেখে মাত্র, লাভে হর্ষ বোধ করে না, অলাভে ক্রোধও করে না। এখানে ভোগ তিন প্রকার, প্রিয়, অপ্রিয় ও উপেক্ষা। জীব ভোগের এই তিন প্রকার আকার মণিতে আরোপ করিয়াছে ; ঈশ্বর এক রকম করিয়াই মণিকে সৃষ্টি করিয়াছেন ; জীবের জ্ঞান বিভিন্ন প্রকার বলিয়া ভোগের আকার বিভিন্ন হইয়াছে ; যে বৈরাগ্যযুক্ত সে মণি পাইলে হৃষ্ট হয় না, না পাইলে বিমর্ষও হয় না ; যাহারা বিষয়াসক্ত, তাহারা মণি পাইলে হৃষ্ট হয়, না পাইলে বিমর্ষ হয়, রাগিয়া যায়। স্বরূপতঃ ঈশ্বর নির্ম্মিত স্ত্রীর একই স্বরূপ, তাহার ভেদ নাই ; কিন্তু সেই এক স্ত্রী কারুর পত্নী, কারুর পুত্রবধূ, কারুর ভগ্নী, কারুর জা, কারুর ননদ, কারুর মা, কারুর খুড়ি ইত্যাদি। বাহ্য বস্তু দুই প্রকার ; বাহ্যে পঞ্চভূতময়, অন্তঃকরণে মনোময়। পত্নী, পুত্রবধূ ইত্যাদিরূপে একই স্ত্রী ভিন্ন ভিন্ন লোকের মনে ভিন্ন ভিন্ন ভাব জাগাইতেছে ; তা'হলে এগুলি সব মনের ভিন্ন ভিন্ন ভাব ; তাই এগুলিকে মনোময় বলা যায় ; কিন্তু যে স্ত্রীলোক ভিন্ন ভিন্ন মনে ভিন্ন ভিন্ন ভাব জাগাইতেছে, সে স্ত্রীলোকের আকৃতির কোন বিশেষ হইতেছে না,

পাঞ্চভৌতিক দেহের কোন পরিবর্ত্তন হচ্চে না; ঈশ্বরসৃষ্ট স্ত্রীলোক একরূপ হইলেও নানা লোকের জ্ঞানে বিভিন্ন ভাবের উদয় হচ্চে। যদিও বাহ্যে দৃশ্যমান মাংসময়ী স্ত্রীর ভেদ নাই বটে, কিন্তু অন্তঃকরণবৃত্তিস্থ সেই মনোময়ী স্ত্রী পত্নী, বধূ, মা, খুড়ি প্রভৃতি নানাপ্রকারে কল্পিত হয়।

এখন প্রশ্ন হচ্চে যে, ভ্রান্তি, স্বপ্ন, মনোরাজ্য এবং স্মৃতি ইহাতেই বাহ্য বস্তুর মনোময় স্বরূপের সম্ভব হয়; কিন্তু জাগ্রদবস্থায় বাহ্যবস্তুর মনোময়ত্ব কিরূপে সম্ভব? এ প্রশ্নের সিদ্ধান্ত হচ্চে বাহ্যে দৃশ্যমান বস্তুতে চক্ষুঃ প্রভৃতি সংযোগ দ্বারা অন্তঃকরণ সংযুক্ত হইলে সেই বাহ্যবস্তুর যে রূপ আকার, অন্তঃকরণও সেই আকার ধারণ করে; সুতরাং জাগ্রত অবস্থাতেও মনোময় হওয়া সম্ভব। একটা দৃষ্টান্ত দেখ,—স্যাকরার দোকানে মূচির মধ্যে সোণা রেখে আগুনে গালান হ'য়েছে; এই গলা-সোণা যে ছাঁচে ঢালা যায়, তাহার আকার প্রাপ্ত হয়; সেই রকম জীবের অন্তঃকরণটা যেন গলা-সোণা, চক্ষুঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয় যোগে সেই অন্তঃকরণটা যে কোন বাহ্যবস্তুরূপ ছাঁচে ঢালা যায়, অন্তঃকরণ অমনি সেই ছাঁচের আকার প্রাপ্ত হয়। আমি একটি গাছ দেখিলাম এ কথার অর্থ কি? বিশ্লেষণ কর, বিচার কর, বিচার করিয়া দেখ কাজটা কেমন করিয়া সাধিত হ'ল, বুঝিবার চেষ্টা কর, তবে সেই প্রক্রিয়া বুঝিতে পারিবে। দর্শনশক্তি (চক্ষুঃ) অন্তঃকরণকে আনিয়া গাছের ছাঁচে ঢালিয়া দিল, তাই আমার অন্তঃকরণ গাছের আকার প্রাপ্ত হইল; আমি একটি গান শুনিলাম, এখানে শ্রবণশক্তি আমার অন্তঃকরণকে আনিয়া গানের ছাঁচে ঢালিয়া দিল, তাই আমার অন্তঃকরণ গানের রূপ প্রাপ্ত হইল; ইহাই হইল আমার গান শোনার প্রক্রিয়া। এই প্রক্রিয়া সাহায্যে জাগ্রৎ অবস্থাতেও বাহ্যবস্তু মনোময় হওয়া সম্ভব। সর্ব্ব বস্তু-প্রকাশক অন্তঃকরণ যখন যে বস্তুকে অধিকার করে, তখন তদাকারে পরিণত হয়। তদ্ভিন্ন তৎতদ্ বস্তুর জ্ঞান হয় না। বাহ্য বস্তু সকল চক্ষুঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের নিকটস্থ হইলে বুদ্ধিস্থ মাতৃচৈতন্য হইতে অন্তঃকরণবৃত্তি উৎপন্ন হইয়া সেই বস্তুকে অধিকার করতঃ তদাকারে পরিণত হয়; সুতরাং যে বস্তু যেমন বাহ্যে পাঞ্চ-ভৌতিক, সেই বস্তু সেই রকম অন্তঃকরণে মনোময়।

পূর্ব্বোক্ত যুক্তিদ্বারা ঘটাদি বিষয় সকল দুই প্রকারে নিরূপিত হইল, অর্থাৎ ভৌতিক ও মনোময়। যেমন বাহ্যে ঈশ্বরসৃষ্ট ঘট মৃণ্ময় সেইরূপ জীবকর্ত্তৃক সৃষ্ট

অন্তঃকরণে উহা মনোময়। বাহ্যে মৃণ্ময় ঘট চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় দ্বারা জ্ঞেয়, আ অন্তঃকরণে মনোময় ঘট সাক্ষিচৈতন্য দ্বারা প্রকাশিত।

মনোময় বস্তু সকলই জীবের সংসারে বদ্ধ হইবার হেতু। জীবসৃষ্ট মনো বস্তুই জীবের সংসারে বন্ধের কারণ। মনোময় বস্তুর বিদ্যমানতাতে সুখ দুঃখ উৎপন্ন হয়, আর তাহার অবিদ্যমানে সুখ বা দুঃখ কিছুই হয় না। জাগ্র অবস্থার বিচার এখানেই শেষ হইল।

এখন স্বপ্ন ও সুষুপ্তি অবস্থা বিচার করিয়া দেখা যাক্। স্বপ্নাবস্থায় (নিদ্রা সময়) চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গণ বাহ্য বস্তু গ্রহণ করে না, তাহারা বাহ্য ছাড়িয়া অন্তঃ মুখী হয়। বাহ্য বস্তু বাহিরেই পড়িয়া রহিল। মাতৃচৈতন্য বুদ্ধিতে অবস্থি আছে; বুদ্ধিস্থ চৈতন্য হইতে অন্তঃকরণ বৃত্তিগুলি জন্মগ্রহণ করে বলিয়া বুদ্ধি চৈতন্যকে মাতৃচৈতন্য বলা হইয়াছে। ইন্দ্রিয়গুলি বাহ্য বস্তু আনিয়া বুদ্ধি চৈতন্যের নিকট হাজির করিলে তবে ত অন্তঃকরণ বৃত্তি জন্মলাভ করিবে কিন্তু স্বপ্নাবস্থায় ইন্দ্রিয়গুলি বাহ্যবস্তুর সহিত সংশ্লিষ্ট নয়, তারা অন্তরমুখ হইয়াছে। কাজেই বাহ্যবস্তুর জ্ঞানের অভাব হইয়াছে। কিন্তু মনোময় বস্তু অভাব ঘটে নাই। পূর্ব্ব দৃষ্ট বাহ্যবস্তুর সংস্কারবশে স্বপ্নাবস্থায় মনোময় বস্তু অভাব নাই; সেই জন্য স্বপ্নাবস্থায় জীব মনোময় বস্তুর দ্বারা আবদ্ধ হয় সুতরাং সে সময় জীব এই মনোময় বস্তুর দ্বারা বদ্ধ হইয়া সুখ-দুঃখ ভোগ করিয় থাকে। সমাধি বা সুষুপ্তি অবস্থায় (বা মূর্চ্ছাবস্থায়) বাহ্য বস্তু সত্ত্বেও মনোম বস্তুর অভাব জন্য জীবের সুখ-দুঃখ বোধ একেবারেই হয় না। মনে কর, কো ব্যক্তির পুত্র দূরদেশে চাকরি করিতে গিয়াছে; এখন যদি কোন মিথ্যাবাদী প্রতারক আসিয়া তাহাকে বলে যে, "তোমার পুত্রের মৃত্যু হইয়াছে". তাহ হইলে তিনি অবশ্যই কাঁদিয়া ফেলেন ও শোকে অভিভূত হইয়া পড়েন; কেন? শ্রবণেন্দ্রিয় বাহ্যবিষয় (মৃত্যু সংবাদ) বুদ্ধিস্থ মাতৃচৈতন্যের নিকট উপস্থি করিয়াছে এবং তাহাতে অন্তঃকরণ বৃত্তি জন্মলাভ করিয়া মনোময় বস্তুর সৃষ্টি করিয়াছে (পুত্রের মরণ দৃশ্য); ফলে তিনি (শ্রবণকারী) শোক দুঃখ ভোগ করিতেছেন। আবার মনে কর, বিদেশগত পুত্রের সত্য সত্যই মৃত্যু ঘটিয়াছে কিন্তু পিতা সংবাদ পান নাই; কাজেই বেশ প্রফুল্ল আছেন; এক্ষেত্রে বাহ্য বস্তুর থাকা (পুত্রমৃত্যু) সত্ত্বেও মনোময় বস্তুর অভাব হওয়ায় পিতার শোক দুঃখ

ভোগ হইতেছে না। অতএব মনোময় জগৎ যে সর্ব্ব জীবের সংসার বন্ধের কারণ, ইহা সর্ব্বপ্রকারে সিদ্ধ হইল।

বেশ কথা। যখন মনোময় বস্তুই—মনোময় জগতই—সর্ব্বজীবের সংসারে বদ্ধ হইবার কারণ, তখন বাহ্য জগতের কি দরকার? বাহ্য জগতের অস্তিত্বের প্রয়োজন আছে; কেন না, বাহ্য জগতের সত্তা ব্যতীত অন্তঃকরণে মনোময় জগৎ গড়িয়া উঠে না, বন্ধের কারণ অন্তঃকরণে সেই সেই বস্তুর আকার প্রতিভার সম্ভাবনা নাই। স্বপ্নকালে পূর্ব্ব পূর্ব্ব সংস্কার বশে মনোময় জগত গড়িয়া উঠে; যদি বাহ্য জগৎ একেবারেই না থাকে, তবে পূর্ব্ব পূর্ব্ব সংস্কার জন্মাবে কিরূপে? একটা বাহ্য জিনিষ দেখ্‌লে, তার ছাপ—তার সংস্কার মনের মধ্যে জন্মায়। কাজেই বাহ্য জগতের অস্তিত্ব স্বীকার ক'রতেই হবে। অতএব প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ-সিদ্ধ বাহ্য জগৎ কোন প্রকারে মিথ্যা নহে।

যখন বেশ বোঝা গেল যে মনোময় জগৎ সংসার বন্ধের একমাত্র কারণ, তখন মনকে নিরোধ করিতে হইবে; এমন ক'রে মনকে নিরোধ কর্‌তে হবে যেন অন্তঃকরণ বৃত্তি আর না জন্মাতে পারে। বেশ ত, মন নিরোধ করিতে পারে এমন কোন যোগ অভ্যাস অবলম্বন করিলে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হ'তে পারে; ব্রহ্মজ্ঞান আলোচনার কি দরকার? মনোনিরোধাত্মক যোগাভ্যাসের দ্বারা তাৎকালিক দ্বৈতজ্ঞান নিবৃত্ত হয় বটে, কিন্তু পুনঃ পুনঃ জন্মমরণরূপ সংসারবন্ধন ব্রহ্মজ্ঞান ব্যতিরেকে কোন প্রকারে ঘুচিবার নহে, ইহা বেদান্তে বার বার বলা হইয়াছে।

ঈশ্বর সৃষ্ট বাহ্য দ্বৈত জগতের নিবৃত্তি না হ'লেও তাহাতে মিথ্যা জ্ঞান হ'লেই অদ্বিতীয় পরব্রহ্ম জ্ঞান হয়। ঈশ্বর কর্ত্তৃক সৃষ্ট বাহ্য দ্বৈতপ্রপঞ্চ অদ্বৈত-তত্ত্ব জ্ঞানের বিরোধী নহে, বরং তা' দ্বারাই অদ্বৈত তত্ত্বজ্ঞান জন্মায়। গুরু বা শাস্ত্রোপদেশ ব্যতীত কিম্বা দ্বৈত-প্রপঞ্চে মিথ্যাজ্ঞান ব্যতিরেকে অদ্বৈত-তত্ত্বজ্ঞান হওয়ার কোন সম্ভাবনা নাই। সুতরাং বাহ্য দ্বৈতপ্রপঞ্চের প্রয়োজন স্বীকার করিতেই হয়।

এখন জীব-সৃষ্ট মনোময় দ্বৈত-প্রপঞ্চের বিচার করা যাক্। জীব সৃষ্ট দ্বৈত প্রপঞ্চ দু'রকম:—১। অশাস্ত্রীয় মনোময় দ্বৈত-প্রপঞ্চ;—আমার বাগান চাই, পুকুর চাই, ধান জমি চাই, তা' নইলে আমার সংসার চল্‌বে কিসে? আমার

ইন্দ্রিয় তৃপ্তির জন্য স্ত্রী চাই; বুড়োবয়েসে আমার সেবার জন্য ছেলে মেয়ে চাই; পরকালে স্বর্গপ্রাপ্তির আশায় যে পুণ্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান, যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান,—এইগুলি জীব-সৃষ্ট মানস দ্বৈত-প্রপঞ্চ এবং এইগুলিকে জীবের অশাস্ত্রীয় মানস দ্বৈতপ্রপঞ্চ বলে; ব্রহ্মজ্ঞানার্থীকে এগুলি—এই অশাস্ত্রীয় দ্বৈতগুলি পরিহার করিতে হয়। ব্রহ্মের সহিত অভেদরূপে দ্বৈতপ্রপঞ্চ বিষয়ক বিচারকে **শাস্ত্রীয় মানস দ্বৈত-প্রপঞ্চ** বলিয়া বেদান্তে উক্ত হইয়াছে; যতক্ষণ না তত্ত্বজ্ঞান হয়, ততক্ষণ ইহার অনুশীলন দরকার। তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিবার পর ইহাকেও পরিত্যাগ করিবে, ইহা বেদান্তের উপদেশ। ইহার প্রমাণ কি জান? যেমন পথিক অন্ধকার রাত্রিতে হল্‌কা জেলে পথ অতিক্রম করে এবং গৃহদ্বারে হল্‌কা ফেলিয়া দিয়া গৃহে প্রবেশ করে; সেইরূপ যথাবিধানে বেদ-বেদান্ত শাস্ত্র অধ্যয়ন ও পুনঃপুনঃ অভ্যাস করিবার পর দ্বৈত-জগতের মিথ্যাজ্ঞান লাভ করে, করিয়া অদ্বৈত-ব্রহ্মতত্ত্ব লাভ করিবার পর শাস্ত্র ও বিচারাদি সব ত্যাগ করে। যেমন ধান্যার্থী কৃষক পল মাথায় ক'রে বহিয়া আনে এবং সেগুলি বেশ করিয়া ঝাড়িয়া মাড়িয়া ধানগুলি কুড়াইয়া লইয়া পলগুলি ফেলিয়া দেয়, সেই রকম বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি বেদান্তাদি গ্রন্থসকল অভিনিবেশ পূর্ব্বক পাঠ করিবার পর কোন্‌টি নিত্য বস্তু, কোন্‌টি অনিত্য বস্তু বুঝিতে পারে; বুঝিতে পারিবার পর শাস্ত্র গ্রন্থাদি ত্যাগ করে। ব্রহ্ম জিজ্ঞাসু বীর সাধক সেই অদ্বৈত-পরব্রহ্মকে জানিয়া সেই জ্ঞান বিষয়েই তৎপর হন, অধিক শব্দাড়ম্বর পূর্ব্বক শাস্ত্রালোচনা করেন না; কেন না, শব্দাড়ম্বর কেবল বাক্যের গ্লানি মাত্র; তাহাদ্বারা কোন ফলোদয় হয় না। শ্রুতি স্পষ্ট করিয়া উপদেশ দিতেছেন যে, বাক্য ও মন সংযত করিয়া সেই অদ্বৈত পরব্রহ্মকে জান, অন্য বাক্য পরিত্যাগ কর। কাম-ক্রোধ-লোভাদি মনের দ্বৈত ভাবগুলিকে এবং মনের কল্পনা রাজ্যকে পরিহার করা ব্রহ্ম জিজ্ঞাসুর একান্ত কর্ত্তব্য। কেননা, কাম-ক্রোধ-লোভাদি এবং মনের অবান্তর কল্পনাগুলি শান্তি ও সমাধি লাভে বিঘ্ন ঘটায়; পক্ষান্তরে শান্তি ও সমাধি ব্রহ্মজ্ঞান লাভের পরিপোষক। ব্রহ্মজ্ঞান সাধনে শান্তি ও সমাধি অনুষ্ঠান শ্রুতি-সিদ্ধ। অদ্বৈত জ্ঞানলাভের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত যে কাম-ক্রোধ-লোভাদি ত্যাগ করিবে, তা নয়; অদ্বৈত জ্ঞান লাভের পরেও কাম ক্রোধাদি ত্যাগ করিতে হয়; তা'হলেই জীবন্মুক্ত বলিয়া দুনিয়ায় খ্যাতি

লাভ করিবে। কাম-ক্রোধাদিতে জড়িয়ে থাকা অজ্ঞানের লক্ষণ; কাম-ক্রোধাদিতে জড়িয়ে থাকা মানেই সংসার বন্ধনে আবদ্ধ থাকা, ব্রহ্মজ্ঞানীর পক্ষে কাম-ক্রোধাদিতে জড়িয়ে থাকা অসম্ভব; আত্মজ্ঞানী কামক্রোধাদি পরিত্যাগ করিয়া থাকেন; কামক্রোধাদি পরিত্যাগ করিয়া ব্রহ্মজ্ঞানী যতদিন জীবনধারণ করেন, ততদিন তাঁহাকে জীবন্মুক্ত বলে। অদ্বৈত তত্ত্বজ্ঞানী কুকুর শৃগালের ন্যায় যথেচ্ছাচারী হইয়া ঘৃণিত জীবনধারণ করিতে পারেন না; তাঁহারা কামক্রোধাদি সমুদায় মনের দোষ পরিত্যাগ পূর্ব্বক দেবতার ন্যায় সর্ব্বলোকে পূজ্য হন।

কাম্য বস্তুতে অনিত্যত্বাদি দোষের অনুসন্ধান করাই কাম-ক্রোধাদি পরিত্যাগের অব্যর্থ উপায়। মোক্ষ প্রতিপাদক বেদান্তাদি শাস্ত্রে ইহা ভূয়োভূয়ঃ প্রতিপাদিত হইয়াছে। আচ্ছা বেশ কথা; মনের দোষ কামক্রোধাদি অশান্তিজনক, অনিষ্টজনক বলিয়া না হয় ত্যাগ করিলাম; কিন্তু মনোরাজ্য—মনে মনে নানাপ্রকার কল্পনা করিয়া সময় কাটান ত অনিষ্টজনক নহে; তবে মনোরাজ্য-কল্পনা-রাজ্য ত্যাগ করিব কেন? যে সর্ব্বদা বিষয় ধ্যান করে, তাহার তাহাতেই আসক্তি জন্মে, পরে সেই বিষয়ে কামনা হয়, পশ্চাৎ তাহার প্রাপ্তির অভাবে ক্রোধ উপস্থিত হয়, তারপর মোহ, স্মৃতিবিভ্রম, বুদ্ধিনাশ, অবশেষে প্রাণ বিয়োগ হয়; অতএব কল্পনা করা—অবাধে মনোরাজ্যে ঘুরে বেড়ান অপেক্ষা অনিষ্টজনক আর কি হইতে পারে? সবিকল্পক সমাধি অবলম্বন করিয়া নির্ব্বিকল্পক সমাধিতে পৌছান যায়। নির্ব্বিকল্পক সমাধি অনুষ্ঠানই মনোরাজ্য নিবারণের একমাত্র উপায়। সমাধি সাধনে অপারগ তত্ত্বজিজ্ঞাসুর পক্ষে বহুকাল একান্তে প্রণব উচ্চারণেও মনোরাজ্য নিবারিত হয়। মনোরাজ্য পরাজিত হইলে বৃত্তিশূন্য হইয়া মন স্থিরভাবে অবস্থান করে।

অদ্বিতীয় ব্রহ্ম বস্তু ছাড়া জগতে দৃশ্য পদার্থ আর কিছুমাত্র নাই। এই সিদ্ধান্তে দৃঢ় বিশ্বাস হইলে মন হইতে দৃশ্য পদার্থ নিবারিত হয়; তখন পরম নির্ব্বাণ মুক্তির পথ পরিষ্কার হইয়া যায়। অধ্যাত্ম শাস্ত্রসকল বিশেষরূপে বিচার পূর্ব্বক অন্যান্য লোকের সহিত পরস্পর আলোচনা করিয়া বিষয় বাসনা পরিত্যাগ করিতে হয় পরিত্যাগ করিয়া মৌনব্রত অবলম্বন করা উচিত;

মৌনব্রত অবলম্বন অপেক্ষা উত্তম সাধনা আর নাই। প্রারব্ধ কর্ম্মের ভোগ বশতঃ কোন সময়ে মনোরাজ্য কল্পনা নিয়ে আসিয়া চিত্তবিক্ষেপ উপস্থিত করিতে পারে; কিন্তু সাধকের অভ্যাস নৈপুণ্যে পুনর্ব্বার তৎক্ষণাৎ সমাহিত হইয়া পরব্রহ্মে নিমগ্ন হওয়া অসম্ভব নয়।

যে ব্রহ্মনিষ্ঠ সাধকের অন্তঃকরণ কোন প্রকারে বিক্ষিপ্ত না হয়, তাঁহাকে ব্রহ্মজ্ঞ না বলিয়া ব্রহ্মস্বরূপ বলিয়াই তত্ত্বদর্শী মুনিরা বর্ণনা করিয়াছেন। যে ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তি অদ্বৈত পরব্রহ্মে তদ্‌গত-চিত্ত হইয়া শাস্ত্র বিহিত জ্ঞান ও বিষয় জ্ঞান উভয় শূন্য হইয়া কেবল ব্রহ্মস্বরূপে অবস্থান করেন, তিনিই স্বয়ং ব্রহ্ম। জীবসৃষ্ট মানস প্রপঞ্চরূপ দ্বৈত জগৎ অন্তঃকরণ হইতে পরিত্যক্ত হইলে জীবন্মুক্তির পরাকাষ্ঠা লাভ হয়।

—ওঁ শম্—

২৫শে চৈত্র, ১৩৪৬।

"অসক্তিরনভিষ্বঙ্গঃ পুত্রদারগৃহাদিষু"

"Son seriously ill, come sharp—Sutosh"—পিওন্ আসিয়া উপরিউক্ত টেলিগ্রাফটি একটি বৃদ্ধের হাতে দিল। বৃদ্ধটি চুঁচুড়ায় শান্তি আশ্রমে বাস করেন; সরকারি বিদ্যায়তনের অধ্যাপক; উপযাচক হ'য়ে বড় কারুর সঙ্গে মেশেন না, যদি কেউ মিশিতে আসে, তাকে খুব আপনার জন মনে ক'রে বুকে টেনে নিয়ে আলাপ আলোচনা করেন। বৃদ্ধের বড় ছেলে যাদবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে পঞ্চম শ্রেণীতে পড়িতেছে, এইবার final পরীক্ষা দিবে, পরীক্ষার আর মাস ছয়েক বাকি। কলিকাতায় রাসবিহারী এভিনিউর ধারে একটি ছোট পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন একতলা ঘর ভাড়া লইয়াছে, নিজেই ষ্টোভে রাঁধিয়া খায়; নিরামিষ ভোজী, কাজেই খাবার কোন হাঙ্গামা নাই, একটু গাওয়া ঘি ও ভাতে ভাত ও একটু দুধ খায়; তরকারির ভক্ত নয়, রাঁধিবার সময়ও নাই; তার উপর পিতার কঠোর আদেশ—এবার পরীক্ষায়

পাশ হওয়া চাই, নইলে আর খরচ দিবেন না। কাজেই পুত্রকে হাড়ভাঙা পরিশ্রম করিতে হইতেছে। পরিশ্রমের ফলে ও চিন্তাতিশয্যে টাইফয়েডে (haratyphoid) আক্রান্ত হইয়াছে। ছেলের মায়ের মাস্‌তুতো ভাই সুভোষ যাদবপুর কলেজে প্রথম শ্রেণীতে পড়ে; সে সংবাদ পাইয়া ছেলেকে তাহাদের বাড়ীতে লইয়া যায়; ছেলের মায়ের মাসিমা অতি বিচক্ষণ উদার-চরিত্রা; তাঁহার সুব্যবস্থায় ছেলের চিকিৎসা ও শুশ্রূষার কোন ত্রুটি হয় নাই; তাঁহার পুত্রবধূ "শান্তি" শুশ্রূষা করিতে খুব মজবুত; ঔষধ পথ্যাদি খাওয়ান, রাত্রি জাগরণ, বিষ্ঠা-মূত্রাদি স্বহস্তে পরিষ্কার করা প্রভৃতি কাজ এবং মিষ্ট ভাষায় রোগীকে তুষ্ট করিতে থাকিলে ও ১০৫° জরের সহিত বিভুল বকুনি যখন দেখা দিল, ভয় পাইয়া তখন ছেলের পিতাকে উক্ত টেলিগ্রাফ করা হয়।

টেলিগ্রাফ পাইয়া বৃদ্ধ পিতা একটুও উদ্বিগ্ন হইলেন না, কাহারও সহিত পরামর্শ করিলেন না, মাত্র একবার আকাশের দিকে চাহিয়া মুখে বলিলেন,—"অসক্তিরনভিষ্বঙ্গঃ পুত্রদারগৃহাদিষু।"

ছেলের পিতা যথাযথ দৈনন্দিন কাজ করিয়া যাইতে লাগিলেন; টেলিগ্রাফের কোন জবাব না পাইয়া ছেলের মায়ের মাসিমা বলিলেন,—"টেলিগ্রাফ্ হজম ক'রতে পারে, এমন লোক ত কখন দেখিনি"। যাহা হউক, ডাক্তারের সুচিকিৎসায়, মাসিমার সুব্যবস্থায় ও 'শান্তি''র শুশ্রূষায় পুত্র শীঘ্রই আরোগ্য লাভ করিয়াছিল।

টেলিগ্রাফের জবাব না দিবার জন্য বৃদ্ধ যে সকল যুক্তি তর্কের অবতারণা করিয়াছিলেন তাহাই সংক্ষেপে বর্ণনা করা আমাদের উদ্দেশ্য। সাধনা রাজ্যে তাহাদের দাম আছে, উপকারিতা আছে।

বৃদ্ধের শ্রীকৃষ্ণের কথায় খুব আস্থা; শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন, দেহমলোদ্ভব পুত্র কীটবন্মল-নির্ম্মিত। শুক্র-শোণিত দেহমল; সেই দেহমল হইতে পুত্রের উৎপত্তি; পুরীষ দেহমল; পুরীষ হইতে কৃমি-কীটের উৎপত্তি হয়; দেহমল জাত কৃমিকীটের দুঃখ দেখিয়া ত আমরা কাতর হইনা, কষ্ট অনুভব করি না! তবে দেহমল জাত পুত্র কন্যার জন্য আমরা কাতর হইব কেন, কষ্ট অনুভব করিব কেন? পুত্র কন্যার রোগ ভোগের সময় যদি আমরা কাতর হইয়া পড়ি, তা'হলে ত সমদর্শন বজায় রহিল না।

জীব মাত্রেই জগতে আসে তার কর্ম্মফল ভোগ করতে; ভোগান্তে আবার চলে যায়; ভোগ শেষ হলে এক মিনিটও কেউ ধরে রা'খতে পারে না। সুকর্ম্মের ফলে সুখভোগ, কুকর্ম্মের ফলে দুঃখভোগ; পূর্ব্বকৃত কুকর্ম্মের ফলে পুত্র যদি রোগভোগ ক'রতে বাধ্য হয়, দুঃখ যাতনা ভোগ করিতে থাকে, আমি তার ভাগ নিতে যাই কেন? তার দুঃখে আমি দুঃখী, তার যন্ত্রণায় নিজেকে যন্ত্রণাগ্রস্ত মনে করি কেন? তার দুঃখ কষ্ট রোগ যাতনা লাঘবের জন্য সেবা করে যাব, কিন্তু মনে দুঃখ অনুভব করিব না; পুত্রের দুঃখ যাতনার সহিত অধ্যাস ঘটিতে দিব না।

শক্তি মানে আসক্তি—অভিনিবেশ। পুত্রের উপর সক্তি—আসক্তি থাকিবে না—ইহাই শাস্ত্রের উপদেশ। 'ইহা আমার' এই জ্ঞান হইতে যে প্রীতি তাহাকে সক্তি বা আসক্তি বলে। "ইহা আমার" এইরূপ বোধ হইতে আনন্দ না হওয়ার নাম অসক্তি বা অনাসক্তি। সক্তি সাধন পথে বিঘ্ন। অসক্তি অভ্যাস করিতে হয়, টেলিগ্রাফ্ পাইয়া বৃদ্ধ অসক্তি অভ্যাসে ফুটাইয়া তুলিতেছেন। দারা পুত্র দ্রব্য-দ্রবিণ বিষয় বৈভব কিছুই আমার নয়; সঙ্গে করিয়া কিছুই আনি নাই, কেহই আমার সঙ্গে আসে নাই; কাহাকেও আমার সঙ্গে লইয়া যাইব না। জেলখানায় এসেছি জেল খাটতে, কর্ম্মফল ভোগ করতে; পুত্রকন্যারাও এসেছে তাদের নিজের নিজের কর্ম্মফল ভোগ করতে; তাদের উপর আসক্তি স্থাপন করা যুক্তি সিদ্ধ নহে, বুদ্ধিমানের কাজ নহে; তাদের আমার নিজস্ব বস্তু বোধে আনন্দ করি কেন? যে আমার নয়, তাকে আমার বলিয়া কল্পনা করিয়া দুঃখ শোকের বীজ বপন করি কেন? দারা, পুত্র, কন্যা, ধন ও সম্পত্তির উপর যখন সক্তি (আসক্তি) খুব বাড়িয়া যায়, তখন মনে হয়, তাদের সুখে আমি সুখী, তাদের দুঃখে আমি দুঃখী; তাদের জীবনে আমার জীবন, তাদের মরণে আমার মরণ। ইহার নাম অভিষ্বঙ্গ। সক্তি ও অভিষ্বঙ্গ জ্ঞানমার্গের বিঘ্ন। তাই ইহাদিগকে বিচার ও অভ্যাস দ্বারা ত্যাগ করিতে হয়। বৃদ্ধ ইহাদিগকে কেবলমাত্র পুঁথিগত করিয়া রাখেন নাই, কার্য্যকালে ব্যবহার করিতেছেন। তীব্র বিচার শক্তি চাই; দারা-পুত্রের প্রতি আসক্তি ত্যাগ বড় সোজা সাধনা নয়। বিচার চাই, সঙ্গে সঙ্গে অভ্যাস চাই; অভ্যাসের মধ্যে ফুটিয়ে তুল্‌তে না পারলে

সাধনায় এগুতে পা'রবে না। একদিন দু'দিনে অভ্যাস পাকা হয় না, দু এক মাসেও হয় না; বছরের পর বছর ধরিয়া চরিত্রের মধ্যে ফুটিয়ে তুলতে হয়; তবে সক্তি ও অভিষ্বঙ্গ ত্যাগে সাধক কৃতকার্য্য হইতে পারে। তখন অসক্তিরনভিষ্বঙ্গ পুত্রদারগৃহাদিষু সাধকের অনুভূতির ভিতর দিয়া ফুটিয়া উঠে।

আমার তৃপ্তির জন্য মা যে আমার সব সেজে বসে রয়েছেন; আমি চেয়েছি বলে, আমার পুত্ররূপে মা আমার নিকট এসেছেন; আমার তৃপ্তি হবে বলে মা পুত্ররূপে এসেছেন; পিতা-মাতা, দারা-পুত্র, দ্রব্য-দ্রাবিণ, বিষয়-বৈভব, সব রূপেই যে আমার মা; আমার আশা আকাঙ্ক্ষার বস্তুরূপেই মা-ই এসে আমাকে কোলে নিয়ে বসে আছেন—মা! তুমিই যে আমার সব মা! **ত্বমেব সর্ব্বং মম দেবদেব।** পুত্ররূপেও মা তুমি, পুত্রের রোগরূপেও মা তুমি; পুত্রকে রোগগ্রস্ত করে পরীক্ষায় ফেলেছ আমাকে; আমি তোমার দিকে তাকাই, না, ছেলের দিকে তাকাই; সর্প হয়ে দংশ প্রভু রোজা হয়ে ঝাড়; রোগরূপে আস, আবার ঔষধরূপে এসে রোগমুক্ত কর; মা আমি তোমাতে বিশ্বাস হারাইনি মা; তোমাতে অটুট বিশ্বাস আছে মা; ছেলের মধ্যে যে মা তোমাকে দেখতে পাচ্ছি। মা! তোর পায়ের তলায় যে লুটিয়ে পড়ে, তার কি কোন বিপদ থাকে? তুই যে বিপদহারিণী মা আমার! তোর চরণ যে সার করেছে, তার কি কখনো শোক-মোহ, হ'তে পারে মা? তুই যে মা আমার বুকের ধন, প্রিয়া অপেক্ষাও প্রিয়। এস মা আমায় কোলে করে বস মা আমার! আমি যে কত যুগযুগান্তর ধরে তোর দিকে তাকিয়ে বসে আছি মা! ব্যাধিরূপে এসে সাধককে পরীক্ষায় ফেল্‌ছিস্ মা! ভেষজরূপে এসে আস্থাবান সাধকের ব্যাধির যাতনা হরণ করিস্ মা। ছলনাময়ী ছল ত্যাগ কর; আর পরীক্ষা দিতে পারি না মা; পরীক্ষা করিস্ যদি, পরীক্ষা পাশের শক্তি দে মা। তুই যে মা সর্ব্বশক্তিময়ী! সকল শক্তিই যে তোর অধীন মা!

শান্তি-দাত্রী মা আমার, শান্তিহারা ক'রনা মা; যা দেবী সর্ব্বভূতেষু শান্তিরূপিণী মা আমার, তোর ভক্তকে অশান্তির অনলে ফেলে দিস্ না মা! চিতিরূপিণী মা আমার, চৈতন্যহারা করিস্ না মা! তুই যে মা চৈতন্যরূপে সর্ব্বজীবের মধ্যে লুকিয়ে বসে খেলা করছিস্ মা; দেহাত্মবোধের মূলে রয়েছিস্

মা তুই ! কর্ম্মের মধ্যে মা তুই, কর্ম্মফল দাতারূপে মা তুই, আবার সাক্ষীরূপে নির্ব্বিকাররূপে জীব হৃদয়ে মা তুই। দেহস্থোঽপি ন দেহস্থঃ যে মা তুই। এই জ্ঞানটা আমায় পাকা করে দে মা, কর্ত্তৃত্ববোধ চিরতরে ঘুচে যাক্ মা। তোর উপর সকল বিষয়ে পূর্ণভাবে নির্ভর ক'রতে যেন পারি মা! রতনের লোভে যেন কূপেতে ডুবে মরি না মা। যাহার ক্ষণিক প্রেম ক্ষণপ্রভা প্রায় তাদের মলিন পঙ্কে লিপ্ত যেন না হই মা! যাহার সহিত নাই বিচ্ছেদ কখন, তাঁর প্রেমেই সদা যেন ডুবে থাকি মা। আর যেন ভেসে না উঠি। নদী সাগরে মিশে যায় যেন; "আমি" হারা হ'য়ে আমির মূলে যে পরম তত্ত্ব রয়েছেন তাঁর মধ্যে ডুবে যাই যেন। জীবাত্মা পরমাত্মায় মিশে যাক্; "আমি" হারা হয়ে "আমি" হীনদেশে যেন চিরতরে যেতে পাই মা! ওঁ মা-মা-মা!

২৮শে আষাঢ়, ১৩৪৭।

LIBRARY
No.............
Shri Shri Ma Anandamayee Ashram
BANARAS.

ভগবান কোথায়?

সাধক, তুমি সাধনায় বসিয়াছ; পূজা করিতেছ; গন্ধ-পুষ্প-ধূপ-দীপ-নৈবেদ্যাদি দিয়া পূজা করিতেছ; মন্দিরে যাইতেছ; মস্‌জিদে যাইতেছ, গির্জ্জায় যাইতেছ। কখন কখন দল বাঁধিয়া কীর্ত্তন করিতেছ; স্তব স্তুতি আওড়াইতেছ; ভগবানের পূজার জন্য কত শত জীব বলি দিতেছ; কত সাধু অরণ্যে পর্ব্বত গুহায় বাস করিতেছেন; ভগবানকে পাবার জন্য, জানিবার জন্য কেহ জটা ধারণ করিতেছেন, কেহ মুণ্ডিত-কেশ হইতেছেন, কেহ গেরুয়া পরিতেছেন, কেহ পট্টবস্ত্র ধারণ করিতেছেন, কিন্তু কৈ? ভগবানকে কি পাওয়া যাইতেছে? দেবে পরিচয়ো নাস্তি—পূজা হবে কোথা থেকে? দেবতাকে চেন, জান, তারপর পূজা করিও।

তোমার ঘরে কি আছে আগে দেখ; ঘরের পায়সান্ন ত্যাগ করে পরের দোরে ভিক্ষা কর্‌তে যেতে নাই। যে দুর্ম্মতি, সেই ই স্বগেহে পায়সং ত্যক্ত্বা ভিক্ষাং অটতি। আপন দেহে দেবতাকে পূজা করিতে হয়; আপন দেহকে

দেবমন্দির বোধে মার্জ্জনাদি দ্বারা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন শুদ্ধ, পবিত্র রাখিতে হয়; দেহাধিপতিকেই দেবতা বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। দেহাধিপতিকেই পূজা করিতে হয়, ধারণা করিতে হয়, ধ্যান করিতে হয়; মৃৎশিলা ধাতু নির্ম্মিত মূর্ত্তিতে কখন দেবপূজা করিতে নাই। অন্য দেহে কখন দেবপূজা করিতে নাই; স্বদেহে পূজয়েৎ দেবং, নান্যদেহে কদাচন। মূর্ত্তিপূজা করে কখন কেহ ভগবানকে পায়নি। উপবাস করেও ভগবানকে পাওয়া যায় না; লক্ষ লক্ষ জপ ক'রেও ভগবানকে পাওয়া যায় না; অগ্নিকুণ্ডে শত সহস্র আজ্য-মিশ্রিত বিল্বপত্র আহুতি দিলেও তাঁকে পাওয়া যায় না। ন মূর্ত্তি-জপনাৎ হোমাৎ উপবাস-শতৈরপি।

আপন দেহের মধ্যে খুঁজে দেখ; দেহ-তত্ত্ব আলোচনা কর; ঘরে কি আছে না আছে ভাল করে তন্ন তন্ন করে দেখ; সন্ধান পাবে; দেবতার সন্ধান পাবে। দেহাধিষ্ঠিত চৈতন্যই প্রকৃত দেবতা। সেই দেবতার পায় পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়রূপ পঞ্চোপচার নিবেদন করিয়া দাও; তা'হ'লেই পঞ্চোপচারের পূজা করা হবে। যখন পঞ্চোপচার পূজায় সিদ্ধিলাভ হবে, তখন দশোপচারের পূজা করিও; পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও পঞ্চ তন্মাত্রা এরাই দশোপচার। রূপ-রসাদির সহিত পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়কে দেবতার পায় উৎসর্গ করিয়া দাও; একবার দিলে হবে না; দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর ধরিয়া দশোপ-চারে পূজা করিতে থাক; যখন সত্য সত্যই দশোপচারের পূজা হইতে থাকিবে, তখন তোমার সত্য প্রতিষ্ঠা হইবে; দশোপচারের পূজায় সত্য প্রতিষ্ঠা হইলে—সিদ্ধিলাভ করিলে, তখন ষোড়শোপচার পূজায় অধিকার জন্মিবে। পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চতন্মাত্র ও মন এরাই হ'ল ষোড়শোপচার। ঠাকুরের পায় তোমার এই ষোলটি উপচার সর্ব্বস্বত্বরহিত হইয়া নিবেদন করে দও; উজাড় করে ঢেলে দাও; উহাদের আর 'আমার' বলে ভেব না, মনেও ক'র না; নিবেদনের পর আর তাহারা তোমার নয়; দৃঢ় বিশ্বাস রাখ; স্বার্থ বলি দাও; নিবেদনের পর তাহারা প্রসাদী ফুল; মাথায় ধারণ কর; পূজার নিবেদিত অর্ঘ্য হিসাবে অতি সযত্নে সশ্রদ্ধায় ভক্তিভাবে গ্রহণ কর। তবে ত পূজায় সিদ্ধিলাভ হবে; প্রকৃত ঠাকুরের সন্ধান পাবে; ভগবানের প্রকৃত পরিচয় পাবে; আরাধনায় তৃপ্তি জন্মিবে।

তোমার ভিতর ভগবান কি ভাবে কিরূপে বাস করিতেছেন, একবার দেখ, বিচার কর, বেশ করিয়া ধারণা কর, করিয়া উহাতে সমাহিত ভেবে হও।

"আমি আছি" এই যে তোমার জ্ঞান, এই ভাবের যে তোমার চেতনা, ইহাই তোমার অধ্যাত্ম ভাব। এই তোমার নিজত্বকে দেহাভিমানবশতঃ সর্ব্বদাই দেহী এইরূপ ভাবিতেছ; দেহ পঞ্চ ভুতময়; সুতরাং তোমার নিজত্বকে সর্ব্বদা ভূতময় বলিয়া অবগত হইতেছ, তোমার দেহাভিমান আছে বলেই, পরমাত্মাকে অধিভূত বলে; তোমার এই দেহাভিমানের মূলে আত্মা অধিভূত বলিয়া পরিচিত। এইবার তোমার হৃদয়ের দিকে চাহিয়া দেখ; এখানে তুমি সুখ-দুঃখ ভোগ করিতেছ; হর্ষ-বিষাদ ভোগ করিতেছ; ভোগ আনন্দে সদাই তুমি ব্যস্ত রহিয়াছ; ইহাই তোমার কর্ম্মক্ষেত্র; ইহাই তোমার যজ্ঞভূমি; হৃদয়টাই যথার্থ কর্ম্মভূমি; প্রথমে হৃদয়ে সকল কর্ম্মের ভাব জাগে, উৎকর্ষ লাভ করে, পরে সেই ভাব খুব ঘনীভূত হ'লে ব্যবহারিক কার্য্যে পরিণত হয়। তুমি সুখ-দুঃখাদি যা ভোগ ক'রছ, সেটা তোমার কর্ম্মফল; এখানে তুমি প্রকৃত যজ্ঞ ভোক্তা; এই যজ্ঞভূমিতে তোমার আত্মভাব জড়িত, আত্মা হৃদয়ক্ষেত্রে থাকিয়া তোমায় কর্ম্মফল ভোগ করাইতেছে; পুণ্য কর্ম্মের ফলস্বরূপ সুখ ভোগের ব্যবস্থা করিতেছেন, পাপ কর্ম্মের ফল স্বরূপ দুঃখভোগের ব্যবস্থা করিতেছেন; তাই তোমার হৃদয়স্থ কর্ম্মফলদাতা অধিদৈব নামে পরিচিত। এ দুটাই ক্ষরস্বভাব, ক্ষয়শীল; দেহাত্ম-বোধ চিরকাল থাকে না, সুখ-দুঃখের ভোক্তা ভাবও চিরদিন থাকে না। সুতরাং অধিভূত ও অধিদৈব উভয়ই ক্ষয় ভাব। এই দুই ক্ষর ভাব ছাড়াও তোমার মধ্যে আর একটি ভাব আছে। তুমি যা কিছু করিতেছ, তার সাক্ষীস্বরূপ তোমার মধ্যে পরমাত্মা বাস করিতেছেন; তুমি ভাল কাজ কর, মন্দ কাজ কর, তোমায় পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়াছেন; কিন্তু তিনি তোমার সকল কাজের সাক্ষী থাকিতেছেন; এবং তোমার দিকে অনিমিষ দৃষ্টিতে চা'হয়া আছেন; একদৃষ্টে তাকাইয়া আছেন, পলক পড়ে না; কাজেই তুমি যে কাজই কর না কেন তোমার হৃদয়ের কোণে যে ভাবনাই উঠুক্ না কেন, তাঁহার দৃষ্টিতে পড়িবেই পড়িবে; কাজেই তিনি সব জানিতে পারিতেছেন, তোমার সকল কাজের তিনি সাক্ষী। ইনিই

পরমাত্মা পরম পুরুষ ; ইনিই তোমার মধ্যে অধিযজ্ঞরূপে পরিচিত। শাস্ত্রে ইঁহাকেই পুরুষোত্তম বলিয়াছেন।

জন্মমরণময় ভূতাশ্রয় ভাবটি ক্ষর-ভাব বা ক্ষর-পুরুষ। সৃষ্ট বস্তু মাত্রকেই পুর বলে ; সেই পুরে যে আত্মা বাস করেন, তিনিই অক্ষর পুরুষ ; ইনিই জীবের মধ্যে অধিদৈব। কর্ম্মকেই যজ্ঞ বলে। প্রত্যেক কর্ম্মে যজ্ঞাধিরূঢ় পুরুষ পরমাত্মা। তাই পরমাত্মাকে পুরুষোত্তম বলা হয় এবং ইনিই প্রতি জীবের মধ্যে অধিযজ্ঞ। ভগবান এই তিন ভাবে জীবের মধ্যে অবস্থিত তাঁকে সদাই আপনার মধ্যে এই তিন ভাবে যুক্ত করিয়া মনন করিলে, ধারণা করিলে, ধ্যান করিলে, আত্ম-সাক্ষাৎকার হয়। সদাই এই চিন্তা করিতে হয় ; পরমাত্মা অধিভূত, অধিদৈব, অধিযজ্ঞরূপে প্রত্যগাত্মা সহিত যুক্ত ; এই চিন্তায় অভ্যস্ত হ'তে হয়। জীবনে যে চিন্তা বেশী করা হয়, সেই ভাবটি মরণ-কালে হাজির হয় ; মরণের সময় ইচ্ছাশক্তি প্রবল থাকে না। ইন্দ্রিয়গুলি অবশ হইয়া আসে ; কাজেই তুমি জোর করিয়া বলিতে পার না যে মরণ সময়ে ঈশ্বর চিন্তা করিবেই করিবে, অন্য চিন্তা আসিতে দিবে না। স্বপ্নকালে যেমন ইচ্ছা-শক্তির জোর থাকে না ; সংস্কারবশে স্বপ্নের আবির্ভাব হয় ; সেইরূপ মরণ কালেও ইচ্ছায় জোর থাকে না, পূর্ব্ব সংস্কার-বশে ভাবের উদয় হয় ; যে বিষয়ের চিন্তা বেশী করা যায়, সেই বিষয়ই প্রয়াণ কালে উদয় হয়। তাই বলি, ভগবানে যোগযুক্তাত্মা হও ; ভগবানকে খুঁজিতে মন্দিরে, মসজিদে, গির্জ্জায়, পর্ব্বত-গুহায় যাইতে হইবে না, ফুল ছোঁড়াছুঁড়িরও দরকার হবে না ; দ্রব্য-সম্ভার নিবেদনেরও আবশ্যক নাই ; কেবল নিরিবিলিতে বসে চিন্তা ; তিনি আমার মধ্যে দেহাত্ম ভাবে, কর্ম্মফল-দাতারূপে, ও কর্ম্মের সাক্ষীরূপে সদা বিদ্যমান ; তাঁর এই অধিভূত, অধিদৈব ও অধিযজ্ঞ ভাবটি সদাই প্রাণে জাগিয়ে রাখ ; তা'হলেই সংস্কার দৃঢ় হবে ; মরণকালে ভগবানের চিন্তাই তোমাকে আচ্ছন্ন করে থা'কবে ; ফলে সুখ-দুঃখের পরপারে, জন্ম-মরণের অতীত-দেশে হাস্‌তে হাস্‌তে চলে যাবে, আত্মানন্দে বিভোর হয়ে থা'কবে ; আর এই জন্মমরণময় সুখ-দুঃখের আগারে ফিরে আস্‌তে হবে না ; পরমাত্মায় জীবাত্মা মিলাইয়া যাবে ; নদী সাগরে গিয়া পড়িবে ; খণ্ড অখণ্ডে মিশিবে ; চিরবিশ্রান্তি পাইবে।

তোমাতে যেমন, সেইরূপ সমস্ত জগতে পরমাত্মা এই তিন ভাবে অবস্থান করিতেছেন ; জীবাত্মারূপে, অক্ষর ঈশ্বররূপে, ও নিরবচ্ছিন্ন পরমাত্মা-রূপে। তোমার হৃদয়ে যেমন তিনি অধিযজ্ঞ, ঐ দ্যু-ভূ শরীর বিশিষ্ট বিশ্বনিয়ন্তা অক্ষর পুরুষের হৃদয়েও তিনি তেমনি অধিযজ্ঞ। শ্রুতি পরমাত্মার এই তিন ভাবকে ত্রিশক্তিরূপা দেবতা বলিয়াছেন।

"পরমাত্মা যখন প্রথম এই তিন শক্তিকে রচনা করিয়া (ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর—রজঃ সত্ত্ব, তম), তাহাদের একটু একটু অংশ লইয়া একটি একটি স্বতন্ত্র মূর্ত্তি রচনা করেন, তখন আপনি তাহার ভিতর আপনার আত্মত্ব অনুপ্রবিষ্ট করিয়া দিয়া, তবে হন এক একটি স্বতন্ত্র জীব। তখন তিনি জীব-হৃদয়ে আসিয়া আপনার অসীম ঈশানত্ব ভুলে যান"। তখন তাঁহার বোধে বৃহত্ত্বের বদলে ক্ষুদ্রত্ব, অসীমত্বের বদলে সসীমত্ব ফুটে ওঠে। এই অনন্ত জীবময় অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড,—এই অনন্ত স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র জীব-সংখ্যা ইহার প্রত্যেকটিই তিনি এইরূপে সৃজন করিয়াছেন ; এইরূপে আত্মদান করিয়া স্বতন্ত্র তোমাকে আমাকে সৃষ্টি করিয়াছেন। ইহারই নাম তাহার জীব সৃজন। এই যে আমি—আমার মধ্যে এমন কিছু নাই, যাহা তাঁহার নহে। তিনি নিজেই আমার আত্মা, আমার নিজত্ব। তাঁর এমনিই ভালবাসা ; নিজের আত্মদান করিয়া তোমায় আমায় রচনা করিয়াছেন, রচনা করিয়া তোমায় দিয়াছেন অবাধ স্বাধীনতা ; তোমার ইচ্ছামত তুমি কাজ করিয়া যাও ; তিনি যে তোমার মাঝে আছেন, তাও তুমি জানিতে পার না ; পাছে তুমি সঙ্কোচ বোধ কর, তাই তিনি এত গুপ্ত, এত গোপন ভাবে লুকিয়ে তোমার হৃদয়-কোণে বসে থাকেন। লুকিয়ে থা'কলেও তোমার প্রত্যেক কাজটি তিনি লক্ষ্য করিতেছেন। তোমায় স্বাধীনতা দিলেও তিনি তোমায় ভুলে যান নাই ; আত্মদান দিয়ে আপনার বুকের রক্ত দিয়ে যাকে গড়েছেন, তাকে কি ভুলতে পারেন? তোমাকে ভোলা মানে নিজেকে ভোলা। ভোলেন না শুধু নয়, তিনি তোমায় লীলা-বিলাসের শেষে যখন তুমি তাঁহাকে চাইবে, তখনই তিনি তোমায় আবার চিরদিনের জন্য ফিরাইয়া লইবেন ; অনুলোম-গতিতে জীব পরমাত্মা হইতে নামিতে নামিতে নিম্নতম স্তরে আসিয়া পৌছায়, আবার শম-দমাদি সাধন-ভজন দ্বারা বিলোম-গতিতে যেখান হইতে উৎপত্তি সেখানে আসিয়া

হাজির হয়। ইহাই প্রকৃতির লীলা ; ইহাই মায়ের আমার স্নেহ লীলা-বিলাস। এমনিই প্রীতির আবেষ্টন দিয়া তোমায় ঘিরিয়া রহিয়াছেন। তোমার মনোময় ভৌতিক অধ্যাত্ম কেন্দ্রে তোমাকে ধরিয়া তোমায় অধিভূত-রূপে তিনি অবস্থান করিতেছেন। তুমি তোমার সমগ্র চিত্ত-ক্রিয়ার তলে যে অসঙ্গ অপরিণামী আত্মবোধ রহিয়াছে দেখিতে পাও, ঐ তাঁর অধিভূত-রূপ। বিজ্ঞানময় ক্ষেত্রে তাঁর অধিদৈব রূপ। আর হৃদয়ে তাঁর অধিযজ্ঞরূপ মস্তিষ্কে তোমার অনুশাসক, হৃদয়ে ভোগের অভোক্তা সাক্ষী, তোমার ভূতময় আমিত্বের তলায় মূলাধারে তোমার ধর্ত্তা। এই ভাবে তাঁকে দে'খতে হয়, এই ভাবে তাঁকে জান্‌তে হয়। এই তিন ভাবে তাঁকে জান্‌তে পা'রলে, আর অজানা কিছু থাকে না ; সব জানা হয়ে যায় ; জ্ঞান, জ্ঞেয়, জ্ঞাতা এক হ'য়ে যায়। ওরে সাধক আয়, ছুটে আয় ; এইরূপে সাধনা কর, এই তিন রূপে তাঁকে পূজা কর, পূজা করতে ক'রতে আপনাকে ভুলে যা, পূজ্য পূজক এক হয়ে যাক্ ; জলের তরঙ্গ জলে মিশে যাক্ ; সুখ দুঃখ চির অবসান হ'ক ; শান্তিবারি বর্ষিতে থাক।

৮ই আষাঢ়, ১৩৪৭।

কর্ম্মভূমি, না জেলখানা ?

ওরে মন, আর কত কাল ঘুমিয়ে থাক্‌বি ? কাল ঘুমঘোর কি তোর এখনও ঘুচলো না ? কার জন্য এত ছুটোছুটি ক'রে মর্‌ছিস্ ? কিসের জন্য এত ছুটোছুটি, এত কান্নাকাটি, এত আঁটাআঁটি ? দারা পুত্র পরিবার, তারা কার কে তোমার, একবার ভেবে দেখ দেখি ; যখন দুনিয়ায় এসেছিলি, তখন কি তাদের সঙ্গে এনেছিলি ? না, যখন দুনিয়া ছেড়ে চলে যাবি, তখন তাদের সঙ্গে নিয়ে যেতে পারবি ? একা এসেছিস্, একা চলে যাবি ; জেল খাট্‌তে এসেছিস্ নীরবে জেল খেটে চলে যা। কর্ম্মফল ভোগ করতে এসেছিস্, কর্ম্ম-ফল ভোগ ক'রে চলে যা ; দু'দিনের জন্য এসে, মায়ার ফাঁস গলায় পরিস্ কেন ? তুই কে ? তোর স্বরূপ কি ? জন্মমৃত্যু কি ? জন্মমৃত্যু কেন হয় ? কার

হয়? জন্মের পূর্ব্বে তুই ছিলি কি না, মরণের পর তুই থাক্‌বি কি না? সুখ দুঃখ কি? মানুষ চিরকাল সুখে থাকে না কেন? দুঃখ ভোগ করতে হয় কেন? দুঃখ নিবারণ করতে পারা যায় কি না? নিরবচ্ছিন্ন সুখ পাবার উপায় কি? একটু ভেবে দেখ্ দেখি, একটু নির্জ্জনে বসে প্রশ্নগুলি চিন্তা কর্ দেখি।

যেমন কর্ম্ম, তেমনি ফল. সুকর্ম্ম কর, সুফল পাবে; কু-কর্ম্ম কর, কুফল পাবে। আগুনে হাত দাও, হাত পুড়বে; জ্বালা করবে, কাঁদতে হবে, চখে জল ঝ'রবে, ঘা হবে, ঘায়ের যাতনা ভোগ করতে হবে, ডাক্তারের বাড়ী ছুটোছুটি ক'রতে হবে, ডাক্তার ছুরি কাঁচি চালিয়ে দাগার উপর আর একটু দাগা দিবে, সে দাগাও সহ্য কংতে হবে, ব্যাণ্ডেজ বাঁ'ধবার সময় আইয়োডিনের জ্বালা সহ্য করতে হবে, একদিন নয়. দুদিন নয়, কিছু কাল ধরে এ যাতনা ভোগ করতে হবে। আগুনে হাত দেওয়ার কি সুখ—এখন বুঝলে ত! আগুনে আর হাত দিও না, যাতনাও আর ভোগ ক'রতে হবে না।

সংসারে যাদের নিয়ে মজে আছ, এই মজে থাকার ফল একবার বিচার ক'রে দেখ; একা ছিলে হেসে খেলে বেড়াচ্ছিলে, দু'পয়সা রোজগার কর্‌ছিলে, নিজের খরচ চালিয়েও পরের মুখের দিকে চাইতে পার্‌ছিলে; তারপর বিয়ে ক'রেছ, বিয়ে হ'লেই পুত্র কন্যা, আসে যেন প্রবল বন্যা। এখন তোমার ঘর ভর্ত্তি ছেলে মেয়ে; তাদের সুখ দুঃখের ভাবনা ভা'বতে হয়; তাদের খাওয়াতে পরাতেই তোমার প্রাণান্ত পরিচ্ছেদ. তার উপর তাদের রোগ ঘোগ আছে, ঔষধ-পথ্যের খরচ আছে, শিক্ষা দীক্ষার খরচ আছে, মেয়েদের বিয়ের দমকা খরচ আছে, অসুখ বিসুখের সময় রাত্রি জাগা আছে, ছেলে মেয়ের অত্যাচারে অবিচারে মানসিক কষ্টভোগ আছে; এত জ্বালামালা. এত মানসিক যাতনা আমি ডেকে এনেছি, বিয়ে ক'রে ডেকে এনেছি। একে পয়সার অভাব, তার উপর এত দুর্ভাবনা; আমাকে পাগল ক'রে তুল্‌লো। এত দুঃখভোগের কারণ কেবলমাত্র "আমার আমার বোধ" আমার ছেলে, আমার মেয়ে, আমার স্ত্রী, আমার পরিবার. আমার বিষয়-বৈভব, আমার সংসার—এই আমার আমার বুলিই আমাকে দুঃখে ডুবাইয়া মারিতেছে। আরও দেখ, দেহটা আছে বলেই দারা পুত্র পরিবার বিষয় বৈভবের সহিত আমার

সম্বন্ধ ; তাদের মায়ায় মজে থাক্‌বার ফলে মরণের পর আবার কুকুর, বিড়াল, গরু, ইন্দুর, সাপ হ'য়ে মায়ার সংসারে জন্ম নিতে হয় ; যাদের মায়ায় মজে আছ, তাদের মধ্যে এসে হাজির হতে হবে ; কুকুর হয়ে জন্মেছ, পাঁচ বাড়ীর লাথি ঝাঁটা খেয়ে পেট ভরিয়ে এসে তোমার পূর্ব্ব-জন্মের বাড়ী পাহারা দিচ্চ ; বলদ হয়ে জন্ম নিয়ে পূর্ব্বজন্মের ছেলেদের হাতে চাবুক খাচ্চ, আর তাদের পাকা ধান মাঠ হ'তে বহে এনে দিচ্চ, তারা তুমি যে তাদের পিতা ছিলে তাহা জানতে পারছে না, কিন্তু তুমি মনে মনে জানতে পারছ, মানুষের ভাষা বলতে পারনা বলে কিছু বলতে পারছ না।

তারপর দেহের কথা। কতকগুলি কর্ম্মফল ভোগের জন্য তার উপযুক্ত দেহ পেয়েছ ; সেই কটী কর্ম্মফল ভোগ শেষ হয়ে গেলেই দেহ নষ্ট হয়ে যাবে, পুড়িয়েই ফেলুক, আর মাটীর নীচে পচেই যাক, পঞ্চ ভূতের দেহ পঞ্চভূতে মিশে যাবে। দেহ পাবার পূর্ব্বেও তুমি ছিলে, দেহ নষ্ট হবার পরেও তুমি থাক্‌বে ; মাঝখানে দিন কতক দেহের মধ্যে আট্‌কে আছ। তবেই দেখ, দেহের সঙ্গেই তোমার পাকাপাকি কোন সম্বন্ধ নাই, আর সেই দেহের সম্বন্ধে যারা সম্বন্ধী (দারা-পুত্র, বিষয় বৈভব), তাদের সঙ্গে তোমার কত কম সম্বন্ধ, একবার ভেবে দেখ দেখি! ধর্‌তে গেলে তাদের সঙ্গে তোমার কোন সম্বন্ধই নেই। তাদের জন্য এত দুঃখ-কষ্ট ভোগ কর্‌তে যাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র। টাকা সঞ্চয় ক'র্‌ছ, ম'রবার পর দারাপুত্র সুখে স্বচ্ছন্দে থাক্‌বে বলে, দুঃখে কষ্টে পড়বে না বলে ; তুমি না খেয়ে না দেয়ে টাকা জমিয়ে রেখে যাচ্ছ, তোমার অবর্ত্তমানে তারা যে সেই টাকা ওড়াবে না, অপব্যয় করবে না, তার স্থিরতা কি ? তারা এসেছে, তাদের কর্ম্মফল ভোগ করতে, জেল খাটতে। ওরে মন! জেলখানায় তুই ও এসেছিস্‌, তারাও এসেছে। জেলখানায় এসে তোদের পরস্পরের আলাপ ; যার যতদিন মিয়াদ, সে ততদিন জেলে থাক্‌বে ; যার মিয়াদ ফুরিয়ে যায়, সে তখুনি চলে যায়,তাকে এক মিনিটও কেউ রাখ্‌তে পারেনা। জেলখানার আলাপ,জেলখানায় সম্বন্ধ পাতান,—এ আমার মা, এ আমার বাপ, এ আমার ছেলে, এ আমার পরিবার, এ আমার মেয়ে ইত্যাদি। বিদেশে এসে "সই" "স্যাঙাত্‌", "মনের মানুষ", "দেখন হাসি" পাতান গোছের ব্যাপার। জেলখানার পাতান সম্পর্ক

নিয়ে মজে থাকা বুদ্ধিমানের কাজ নয়। চাচা আপন প্রাণ বাঁচা। নিজের স্বরূপ বুঝতে চেষ্টা কর ; আপনাকে জানতে চেষ্টা কর। পিতামাতার শুক্র শোণিত যোগে তোর দেহের উৎপত্তি। দেহটা তুই নস্; পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ প্রাণ, পঞ্চ বিষয়-তন্মাত্র মন বুদ্ধি নির্ম্মিত সূক্ষ্ম দেহ হ'তেও তুই তেমনি আলাদা ; কারণ দেহ ও তুই নস্। স্থূল, সূক্ষ্ম কারণ দেহের অতীত তুই। তুই চৈতন্যময়, চৈতন্যস্বরূপ ; আনন্দই তোর ধর্ম্ম, সৎ চিৎ আনন্দ দিয়েই তুই তৈরী ; সচ্চিদানন্দই তোর নাম। অস্তি, ভাতি, প্রিয়ই তোর রূপ ; তুই এক নিত্য বিমল অচল, সর্ব্বধী সাক্ষীভূত, দ্বন্দ্বাতীত গগণসদৃশ, ভাবাতীত কেবল জ্ঞানমূর্ত্তি। ওঁ শম্।

৪ঠা ভাদ্র, ১৩৪৭।

সংসারের স্বরূপ বিচার

পুত্র-পরিজনে বেষ্টিত হইয়া গৃহাদি নির্ম্মাণ করিয়া মনুষ্য যেস্থলে বসবাস করে, চলিত ভাষার তাকে 'সংসার' বলে। আমরা যে কোন জাতিতে জন্মাইনা কেন, যে কোন বর্ণগত হ'য়ে জন্মাইনা কেন, আমাদের প্রত্যেকের সংসার আলাদা আলাদা। এই আলাদা আলাদা সংসারের সমষ্টির নাম 'বিরাট সংসার'। আর মানুষের ব্যক্তিগত সংসারের নাম 'ব্যষ্টি সংসার'।

পুরাণ মুখে শুনতে পাই,—যেখানে 'সং'+সার বস্তু, তাকেই সংসার বলে। এক জায়গায় যাত্রা হচ্চে, রাবণ-বধ পালা ; একজন হনুমান সেজে আসরে এসেছে ; সভাস্থ সকলেই বুঝছে, সে প্রকৃত হনুমান নয়, একজন হনুমান সেজে এসেছে মাত্র ; উহার নাচন-কোঁদন, লাফালাফি ভাব-ভঙ্গী দেখে লোকে তাকে হনুমান বলে স্বীকার করে নেয়। একেই বলে 'সং'। চড়কের সময় লোকে 'সং' দেয়, যে যাহা নয়, তাই মেনে নেওয়ার নাম 'সং' অর্থাৎ মিথ্যা। যেখান কার সব বস্তুই এই প্রকার 'সং'-সদৃশ, সেই ক্ষেত্রের নাম সংসার।

আমরা সকলে মায়ের পেট থেকে বেরিয়ে এই সংসারের আতিথ্য গ্রহণ করেছি। ক্রমশঃ বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে খেলামালির সহিত পরিচিত হবার অভ্যাস বাড়্চে। ক্রমশঃ বাপ, মা, ভাই, বোন সকলের সহিত ঘনিষ্টতা বাড়্তে থাকে, পরে পাড়াপড়শী গ্রামবাসী ও ভিন্ন ভিন্ন গ্রামবাসীদিগের সহিত পরিচয় হতে থাকে। ক্রমে মানুষের পরিচয় গ্রাম হ'তে গ্রামান্তরে, সহর হতে সহরান্তরে, দেশ হইতে দেশান্তরে বিস্তৃতিলাভ করে; এবং সংসারকে মায়ার দৃঢ় রজ্জুদ্বারা সুদৃঢ়ভাবে বাঁধিতে থাকে। শৈশবের শিক্ষার সময় আমাদের বাপ, মা, ভাই, বোনের সহিত আমাদের মন নিয়ত অভ্যাস হেতু একীভূত হয়ে পড়ে। সেই সময় মা কি বাপ, ভাই কি বোন—পূর্ব্ব পরিচিত কারুর অভাব হয়ে প'ড়লে তার জন্য মনে অত্যন্ত সন্তাপ উৎপন্ন হয়। ঐ পরিতাপের মূলে রয়েছে—আমাদের অহং ভাব। পিতা ছিলেন, তাঁর অভাবে আমরা নিজেকে সে সময়ে একান্ত নিঃসহায় ও নিরবলম্ব দেখি; মায়ের অভাবে আমরা নিজেকে একেবারে নিরাশ্রয় বলে মনে করি, ভাইয়ের অভাবে নিজেকে বলহীন মনে করি। এইরূপে আমাদের মমতাময় কোন বস্তু নষ্ট হইলেই আমরা দুঃখ শোকে অধীর হয়ে উঠি। কেননা, এই সকল সম্পর্কিত ব্যক্তিদিগের সহিত আমদের আমিত্বের (অহংভাবের) বিস্তৃতি লাভ ঘটেছিল, এখন তাদের অভাবে সেই বিস্তৃতির সঙ্কোচ হয়ে পড়্ল; এই অহংভাবের ("আমার আমার" ভাবের) সঙ্কোচ বোধের নামই দুঃখ শোক। প্রথমে অহংভাবটা আমাদের দেহেই সীমাবদ্ধ ছিল, এখন আর দেহে সীমাবদ্ধ নাই; শরীরেরত মম-তা ("আমার আমার" ভাব) আছেই; তা' ছাড়া পিতামাতা, ভাইভগ্নি, দারা-পুত্র, ধন-সম্পত্তি, মান-যশ ইত্যাদি যে কোন পদার্থ সংসারে আবশ্যক হয়, সেই সকল পদার্থের উপর "মম-তা" ছড়িয়ে পড়েছে; ঐ সকল পদার্থে আমাদের "আমির" বিস্তার লাভ ঘটেছে। যখন আমাদের ধন সম্পত্তি নষ্ট হয়ে যায়, তখন আমরা বলি, "হায়! এবার আমি মারা পড়লুম"। পুত্র বিয়োগে বলি, "এবার আমি মলুম"; মানহানি হ'লে জীবনে ধিক্কার আসে এবং নিজে মরণাপন্ন হয়ে পড়ি। এইরূপে বিশেষ বিচার কর্‌লে দেখা যায়, আমি কেবলমাত্র সাড়ে তিন হাত দেহ মাত্র নই, শরীরের বাইরে যত কিছু মমতার বস্তু আছে, সেগুলিও আমি হয়ে গেছি; এই যে ব্যাপক আমি, এটাই সংসারের

জীবন্ত মুর্ত্তি ; ইহা সংসারের স্বরূপ। প্রত্যেক মনুষ্যহৃদয় এইরূপ ব্যাপক সংসারের এক একটি উপবন বিশেষ। প্রত্যেক মানুষ ওতঃপ্রোতভাবে সংসারে সহিত সংশ্লিষ্ট রহিয়াছে। সুতরাং সংসার বাদ দিলে মানুষের অস্তিত্ব থাকে না। সংসার লোপে মানুষের লোপ, আমিত্বের হানি, সৃষ্টি-নষ্টি হয়ে পড়ে।

উপরের আলোচনা থেকে বেশ বোঝা যাচ্ছে যে 'আমির' অতি বিস্তৃতির নাম সংসার, আর 'আমি'র অতি সঙ্কোচের নাম অ-সংসার। 'আমি'র অতি সঙ্কোচ যে ক'রে করতে হয়, তা সংসারীর পক্ষে বোঝা একটু মুস্কিল।

সাংসারিক পুরুষের অবস্থা এইরূপ :—আমি সংসারী, আমার বাপ-মা, আমার ছেলে-মেয়ে, আমার পরিবার, আমার চাকর-বাকর, আমার বাড়ী ঘর, আমার বাগান-পুকুর, আমার জমি-জোয়াত, আমার ধন-দৌলত ইত্যাদি ইত্যাদি। আমার 'আমি'র বিস্তৃতি খুব বেশী ; তাদের ভালমন্দ ভাবতেই সব সময় কেটে যায় ; তারাই আমার সব। এই এত বড় 'আমি'কে সঙ্কোচ করি কিরূপে ? আমার 'আমি'র এত বড় বিস্তৃতিকে সঙ্কোচ করা আমার সাধ্যাতীত। এই প্রকার অনেক বিভীষিকা উপস্থিত হইয়া আমার "আমি"র অতি সঙ্কোচমার্গে বিঘ্ন ঘটায়। দারা, পুত্র, পরিবার, বাড়ী-ঘর, দ্রব্য-দ্রবিণ নিয়েই ত আমি মেতে আছি ; এদের ছেড়ে আমার 'আমি'র সঙ্কোচ করি কিরূপে ? এদের ছেড়ে আমি থাকবো কি ক'রে ? আমার 'আমি'র বিস্তারের অক্ষমতা দূর করি কেমন ক'রে ? আর এদের ছেড়ে আমার লাভই বা কি ? এ কম বিবিধ যুক্তি আমার 'আমি'র প্রসার আরও বাড়িয়ে তোলে। সুতরাং আমার ভিতর আমার 'আমি'র সঙ্কোচের প্রবৃত্তি জাগে না।

মর্ত্ত্যলোকবাসী গৃহস্থের এই প্রকার যুক্তির খণ্ডন করার জন্য একট পৌরাণিক আখ্যানের অবতারণা করিতেছি। পুরাণে সত্য ঘটনাই বিবৃত হয়, মিথ্যার লেশ মাত্র তাহাতে নাই। আজকালের পুস্তকে মিথ্যাকে সাজিয়ে গুছিয়ে লিখিবার ধারা প্রচলিত হয়েছে ; কিন্তু সেকালে মিথ্যাকে অবলম্বন করে সাদার উপর কালির দাগ দিতে লোকে ভয় পাইত। কাজেই পৌরাণিক উপাখ্যানগুলি যে সম্পূর্ণ সত্য সে বিষয় আর সন্দেহ নাই।

কোন বদ্ধিষ্ঠ নগরে এক ধনবান গৃহস্থ বাস করিত। তার চারিটি ছেলে

ছিল। তার গোলাভর্ত্তি ধান; গোয়াল পূর্ণ গরু, মাছ ভর্ত্তি পুকুর, ফলফুল শাক সব্জি পূর্ণ বাগান ছিল। সুদী কারবারে সে ফেঁপে উঠে ছিল। সুখে স্বচ্ছন্দে তার দিন গুলি বেশ কেটে যাচ্ছিল; এমন সময় ভাগ্যবশে তার এক তত্ত্বদর্শী গুরু জুটল। গুরু মধ্যে মধ্যে এসে শিষ্যকে সংসারের মমতা ত্যাগ কর্‌তে উপদেশ দিয়ে চলে যেতেন। দৈবাৎ একদিন গুরু এসে শিষ্যকে বল্‌লেন, "ওরে তোর কি আর সময় হবে না? নিজের আমিত্বের সঙ্কোচ কর্‌বার অভ্যাস আজও করিলি নি? দিন ত ফুরিয়ে এল!" শিষ্য বল্‌লে, "হাঁ,গুরুদেব! একটা ক্ষেতে এখনও ধান কাটা হয় নি; এই ধানটা গোলাজাত ক'রে মাঘী পুর্ণিমার দিন সংসার ছেড়ে তীর্থ যাত্রা কর্‌ব।" এই কথা শুনে গুরু চলে গেলেন। এদিকে সুদী কারবারে তার অনেক টাকা রোজগার হ'ল; কতক টাকা পিতলের ঘড়ায় ক'রে দেওয়ালের ভিতর পুতিয়া রাখিল। মনে মনে ভাব্‌তে লাগ্‌ল,—আমি যদি এখন চলে যাই, তা'হলে ছেলেরা কি সুদী কারবার ঠিক ঠিক চালাতে পার্‌বে? দুধল গরুগুলির যত্ন-আয়ত্তি কর্‌তে পার্‌বে? নিজেরা সুখে স্বচ্ছন্দে দিন কাটাতে পার্‌বে কি? সব দিকে গুছিয়ে ব্যবস্থা কর্‌তে পারবে কি? আমি না থাক্‌লে ওরা কি মাঠের ফসল ঘরে তুল্‌তে পার্‌বে? এই প্রকার নানান চিন্তায় সেই গৃহস্থ বড়ই অশান্তির ভিতর দিন কাটাতে লাগ্‌ল। ক্রমে ভাব্‌তে ভাব্‌তে তার অবস্থা পাগলের মত হয়ে দাঁড়াল। কখনো ভাবে - যদি কেউ সঞ্চিত ধনের পোতা টাকার সন্ধান পায়, চোরে যদি সঞ্চিত টাকা চুরি ক'রে নিয়ে যায়, তবে ছেলেদের কি দশা হবে? গরুগুলিকে সময় মত ঘাস জল যদি না দিতে পারে, গরুগুলির কষ্ট হবে, তাদের খাবার কষ্ট হলে, দুধ কম হয়ে যাবে; তা হলে ত এরা বড়ই কষ্টে পড়্‌বে! দেনদারদের নিকট কত সুদ পাওনা, কত আসল বাকী— হিসাব ক'রে বুঝে নেবার ক্ষমতা ছেলেদের এখনও হয়নি। মাঠে কখন চাষ দিতে হয়, কখন সার ফেলতে হয়, কখন রুইতে হয়, নিড়ুতে হয়, কাট্‌তে হয়, কাটা ধান মাঠ থেকে চুরি না যায়, ঘরে এনে ঝেড়ে মেড়ে গোলাজাত করা কত শক্ত ব্যাপার; ছেলেদের এখনও সে শিক্ষা হয় নি। এমন অবস্থায় আমি যদি সংসার ছেড়ে চলে যাই, তা হ'লে এদের দুর্গতির সীমা থাক্‌বে না। রাত দিন এই রকম দুর্ভাবনায় তার দিন কাট্‌তে লাগ্‌ল। দেখ্‌তে দেখ্‌তে

মাঘী পূর্ণিমার দিন নিকটবর্ত্তী হয়ে এল। কোন্ সম্পত্তি কোথায়, কি অবস্থায় আছে, কার কাছে কত খাজনা পাওয়া যায়, কোন্ সনের খাজনা পাওনা, কোন্ জমির কোন্ সালের খাজনা দেওয়া হয় নি,—এ সব বলি বলি ক'রেও এত দিন বলা হয় নি। এমন সময় ঠিক মাঘী পূর্ণিমার দিন গুরুদেব এসে ঐ গৃহস্থকে নিয়ে চলে গেলেন। গৃহস্থের অন্তিমকালে যত্নে রক্ষিত গুপ্ত ধনের চিন্তা, মাঠের পাকা ধান ঘরে আন্‌বার চিন্তা কর্‌তে কর্‌তে মৃত্যুমুখে পতিত হল। মৃত্যুর পর সে কুকুর যোনি প্রাপ্ত হ'ল। দিনের বেলা এ বাড়ী ও বাড়ী ঘুরে খেয়ে বেড়াত, রাত্রি হলেই তার পূর্ব্বদেহের যে বাসস্থান ছিল, সেখানে এসে শুয়ে থাক্‌ত ও সারারাত্রি বাড়ী পাহারা দিত। অনেক দিন এই রকমে কেটে গেল। তারপর একদিন গুরুদেব এসে দেখা দিলেন এবং সেই কুকুরকে সম্বোধন করে বল্‌লেন,—"হতভাগা! তুই মৃত্যুর সময়ও বিষয়-বৈভবের মমতা ছাড়্‌তে পারিস্ নি। সেই কারণে অন্তিমকালের মনোবৃত্তি অনুসারে তোর এই নিকৃষ্ট যোনিতে জন্ম হয়েছে। তোর জীবনে ধিক্। আমি তোকে কতবার সংসারের মমতা ছাড়্‌তে বলেছি, কিন্তু তুই আমার উপদেশ গ্রাহ্য করিস্ নি। যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল। এখন কর্ম্মানুসারে ফল ভোগ কর। আমি আর কি কর্‌বো বল।" এই প্রকারে তিরস্কার কর্‌বার পর কুকুরের আত্মগ্লানি উপস্থিত হইল। ইহার কিছুদিন বাদ কুকুরটা মরে গেল; কুকুরের শরীর নষ্ট হ'ল! তারপর ষাঁড় হয়ে জন্মাল; এবারেও পুত্রাদির প্রতি স্নেহ কাতর হ'য়ে ঐ ষাঁড় কুকুরের মত অন্যস্থানে ঘাস জল খেয়ে প্রাণ ধারণ কর্‌ত। ধর্ম্ম ষাঁড়কে কেউ কিছু বলতো না; সে ইচ্ছামত ইতস্ততঃ ঘুরে বেড়াত। ছেলেদের ক্ষেতে ধান পাকলে সেই ধান ব'য়ে আনবার জন্য সেই ষাঁড় ছেলেদের কাছে অতিথির মত এসে উপস্থিত হ'ত। ছেলেরা বে-ওয়ারিশ ষাঁড় পেয়ে ভারী খুসী হত; এবং মাঠ থেকে ফসল ষাঁড়ের পিঠে চাপিয়ে বাড়ী আন্‌তো; ষাঁড়ও বেশ হৃষ্টচিত্তে বোঝা বহিত। ছেলেরা জান্‌তো না যে, ঐ ষাঁড় তাদের পিতা, কিন্তু ঐ ষাঁড় মনে মনে সব জান্‌তো এবং বুঝতো, কেবল মানুষের ভাষা বল্‌তে পারে না ব'লে ছেলেদের কিছু বল্‌তে পার্‌তো না। এইরূপে কিছুদিন কেটে

যাবার পর সহসা একদিন গুরুদেব এসে ষাঁড়কে বল্‌লেন,—"অরে নীচাশয়, এখনও তোর জ্ঞান হ'ল না! এখনও তোর বিষয়-তৃষ্ণা গেল না? যদি এরা তোর ছেলে হয়, আর তুই এদের বাপ হস্‌, তবে পশু হবে কে? যার পিঠে ধানের বোঝা চাপিয়ে ফসল ঘরে নিয়ে যাবে? তুই শারীরিক কষ্টের একবার বিচার করে দেখ্‌ দেখি, কে কার বাপ বা কে কার ছেলে? আপন কর্ম্মফল তুই ভোগ কর্‌ছিস। আমি তোর জন্যে আর কি কর্‌তে পারি? গুরুদেবের তিরস্কারে ষাঁড়রূপী গৃহস্থের বড়ই পরিতাপ হ'ল। এর কিছুদিন পরে ষাঁড়ের দেহান্তর হল। তারপর তার সর্প-যোনিতে জন্ম হল। তখন সেই সাপ পূর্ব্ব দেহ সঞ্চিত অর্থ যেখানে পোতা ছিল, সেখানে সেই ঘড়া বেষ্টন করে পড়ে রইল।

এদিকে ধনবান্‌ পিতার মৃত্যুর পর সুব্যবস্থার অভাবে চারি পুত্রের অবস্থা ক্রমশঃ শোচনীয় হয়ে পড়্‌তে লাগল; গোলায় ধান নাই, গোয়ালে গরু নাই; হাতে টাকা নাই; সুদী কারবার বন্ধ 'য়েগহয়ছ; এখন তাদের হীন দশা। তাদের যে বড় ঘর ছিল, তা বজায় রাখা তাদের পক্ষে শক্ত হয়ে উঠল; আটচালা চার চালায় পরিণত কর্‌বার মতলবই স্থির হ'ল; কাজেই সাবেক দেওয়াল কাটিয়া ছোট কর্‌তে হবে, চার ভাইতে দেওয়াল কাট্‌তে লেগে গেল। মাটির দেওয়াল কাট্‌তে কাট্‌তে এককালে আচমকা ঝন্‌ ঝন্‌ ক'রে শব্দ হ'ল। সকলে মিলে দেখে যে কোদালের ঘা ঘড়ার উপর পড়ায় ঐ শব্দ হয়েছে। তখন কৌতূহল বশে সেখানকার মাটী বেশ ক'রে সরিয়ে দেখে যে একটা মস্ত বড় কাল সাপ ঘড়া জড়িয়ে ফণা ধরে ফোঁস্‌ ফোঁস্‌ কর্‌ছে। ঐ দেখে চার ভাইয়ে মিলে লাঠি মেরে আধমরা ক'রে গর্ত্ত থেকে সাপটাকে বাহির করিল। সেই সাপ স্বভাব বশে কখনও ফণা ধরে এদিক কখনও ওদিক করিতে লাগিল, কখনও বা যন্ত্রণায় উল্‌টে চিতিয়ে পড়্‌তে লাগ্‌লো। তখন সবাই মিলে সর্পরূপী বাপের মাথায় বার বার লাঠি মেরে ফণাটা থেত্‌লে দিল। ঠিক সেই সময়ে গুরুদেব এসে সাপকে বল্‌লেন, "রে হতভাগ্য জীব! ছেলেদের কাছে আজ তুই যে শিক্ষা পেলি, এটা মনে থাক্‌বে ত? তোর পূর্ব্ব দেহে যখন তুই গৃহস্থ ছিলি, তখন তোকে বার বার

সতর্ক করেছিলাম এবং বলেছিলাম সংসারের প্রতি মমতা ক্রমশঃ কম ক'রবার অভ্যাস কর্; গুরু বাক্যে তোর যদি শ্রদ্ধা থাকৃত তা' হ'লে অবশ্যই তুই তা করৃতিস্। অশ্রদ্ধার ফল তুই আজ হাতে হাতে পেলি এখনও কি তুই ছেলেদের মমতায় আকৃষ্ট হয়ে আবার সংসার বন্ধনে গা ঢেলে দিবি? আমি তোকে বার বার তিন জন্ম ধরে সাবধান করছি। এরপর তুই যে শরীর পাবি, যে যোনিতে জন্মাবি—সেখানে আর তুই আমার দর্শন পাবি না, অতএব সাবধান! আর তুই নিজেকে সংসারে ফেলে রাখিস্ না, আর সংসারে মজে থাকিস্ না। কেবল আমার এই কথা মনে রাখ্‌লে তুই সৎ পথ দেখ্‌তে পাবি। এই বলে তত্ত্বদর্শী মহাপুরুষ অন্তর্ধান হইলেন।

সংসারে এসে আমিত্বের সঙ্কোচ করা ('আমার আমার' বুলি ত্যাগ করা) যে কত আবশ্যক, এই পৌরাণিক ইতিহাস পাঠে ইহার সূক্ষ্ম তত্ত্ব পাঠক অবশ্যই বুঝ্‌তে পেরেছ। এই বিনাশশীল জগতে যখন কোন পদার্থই চির-স্থায়ী নহে, তখন অচিরস্থায়ী বিষয়-সম্পদ, পুত্র পরিজনকে 'আপন' বলে মনে করা, তাদের ভালমন্দ চিন্তায় আজীবন ডুবে থাকা, বুদ্ধিমানের কাজ নহে মনুষ্যেতর জীবের চেয়ে মানবের মধ্যে বুদ্ধিবৃত্তি অধিক; বাহ্য জগতে যখন ভাল মন্দ বিচার ক'রে চলতে পারি, তখন অন্তর্জগতে ও সেই প্রকার ভালমন্দ বিচার ক'রে চলতে পারবো না কেন? এই প্রকার দৃঢ়তা দেখান কি গৃহস্থ মাত্রেরই কর্ত্তব্য নয়?

আমরা জানি, মিথ্যা বলা পাপ, এবং চুরি করা বড় পাপ। জেনেও আমরা মিথ্যা কথা বল্‌তেও কসুর করি না, চুরি কর্‌তেও ছাড়ি না। এ রোগের ঔষধ কি? আমি বেশ জানি, মাতা-পিতা, দারা-পুত্র, ভাই-ভগ্নী বিষয়-বৈভব—সব আমরা সংসারে এসে পেয়েছি, এবং এরা সকলেই বিনাশ-শীল। চোখ খুলে সংসারের দিকে তাকালেই এটা বেশ বুঝতে পারা যাবে। বাপ, মা ভাই, বোন এরা চিরদিন থাকে না, মরে যায়; এরা মরবেই। এ সব জেনেও, যখন আমাদের স্বজন বিয়োগ হয়, তখন আমরা কাতর হয়ে পড়ি কেন? নশ্বর পদার্থের উপর মমতা বোধ ক'রে এত স্থান অধিকার করে বসে থাকি কেন? আমি ক্ষুদ্র হ'তেও ক্ষুদ্র, আমার সাম্রাজ্য লাভে কি দরকার? সাম্রাজ্য বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে আমার আমিত্বের বিস্তার অবশ্যম্ভাবী, এটা আমি

কেন ভুলে যাই ? যে সংসারের নশ্বরতা বিচার দ্বারা সদাই প্রাণে অনুভব ক'রতে থাকে, তারই জন্ম সফল। আমিত্বের অতি বিস্তারের ফল যখন এত ভয়ঙ্কর, তখন তা' থেকে তফাৎ থাকা আমার পক্ষে কি পরিণাম দর্শিতার লক্ষণ নহে ?

এই সংসার আমার লীলাক্ষেত্র ; সুতরাং শিক্ষার স্থান। ভূমিষ্ঠ হবার পর থেকে দেহান্ত হওয়া পর্য্যন্ত কেবল শিক্ষালাভের জন্য আমি সংসারে জন্মগ্রহণ করেছি। যে উপযুক্ত প্রণালী অবলম্বনে নিয়ত তত্ত্ববিচার দ্বারা সংসারের ক্ষণ-ভঙ্গুরতা নিয়ত দেখ্‌তে পায়, সে আর সংসারে আসক্ত হয়ে থাকৃতে চায় না। সংসারে যে বস্তু কখন পাওয়া যায় না, সেই বস্তু (শান্তি) লাভের জন্য সে চেষ্টা ক'রে থাকে। সে অবস্থায় তাকে আর সংসারী বলা যায় না। এরূপ লোকের সংখ্যা সংসারে খুব কম। কুম্ভ-মেলা উপলক্ষে দেখ্‌তে পাওয়া যায় যে প্রায় ৩০ হাজার লোক গৃহস্থাশ্রম ছেড়ে, নানা সম্প্রদায়ে বিভক্ত হয়ে, ঘর-দোর ছেড়ে, যদৃচ্ছালাভে হৃষ্টচিত্তে জীবন যাপন করছে। তারা যে সকলেই সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসী—তা অবশ্য ঠিক না হ'তে পারে। কিন্তু এটা খুব সত্য কথা যে, কোন একটা অনির্ব্বচনীয় সুখের লালসায় সর্ব্বপ্রকার সুখের একমাত্র আধার গৃহস্থাশ্রম ত্যাগ ক'রে তারা বানপ্রস্থ বা সন্ন্যাস-আশ্রমের আশ্রয় নিয়েছে।

আপাত-রমণীয়, পরিণাম-দুঃখময় এই লোভনীয় সংসারের যাবতীয় ভোগ্য পদার্থ থেকে মন'কে ঠেকিয়ে রাখা বড় সহজসাধ্য কর্ম্ম নয় ; আর দু-চার দিনের চেষ্টাতেও সেটা হয় না। তত্ত্ববুদ্ধির বিকাশ ছাড়া হৃদয়ে শুদ্ধ বিচারের চিন্তা জাগে না ; এবং শুদ্ধ বিচার ছাড়া সংসারের প্রতি স্বতঃ বিরক্তি উৎপন্ন হয় না। সংসারের প্রতি বিরক্তির চরমাবস্থার নাম বৈরাগ্য (সংসারে আসক্ত না হওয়া)। অতএব সংসারাসক্ত লোকদিগের মধ্যে কারুর পুণ্যফলে যদি কখন সংসার ভোগে বিতৃষ্ণা উৎপন্ন হয়, তা' হ'লে সেই মুহূর্ত্তে সংসারের সমস্ত বিষয় ভোগ তৃষ্ণা চিরকালের তরে ছাড়বার জন্য দীর্ঘকাল ধ'রে কঠোর সাধনা দ্বারা তার এমন তীব্র চেষ্টা করা দরকার যাতে সেই

অবস্থা দৃঢ়রূপে হৃদয়ে স্থির হয়ে বসে যায়। এই প্রকার তীব্র চেষ্টার নাম সদসদ্ বস্তুবিবেক। জগতের কোন্ পদার্থ সৎ অর্থাৎ স্থায়ী, আর কোন্ পদার্থ অসৎ অর্থাৎ অস্থায়ী—নিরন্তর মনে এই প্রকার বিচার করতে থাকলে সময়ে তার ফল স্বরূপ সংসারের প্রতি বিরক্তিভাব জেগে উঠে। কিন্তু এই বিরক্তিকে পাকা বিরক্তি মনে করো না; কারণ, ঘটনা বিশেষে এই অবস্থা থেকে পতনের আশঙ্কা আছে। সুতরাং দৃঢ়তার সহিত ঐ বিরক্তি ভাব হৃদয়ে বদ্ধমূল ক'রবার জন্য দীর্ঘকাল ধরে সাধনার আবশ্যক। একে ত আমার আয়ু কম; দ্বিতীয়তঃ বৃদ্ধাবস্থায় সাধন আরম্ভ করলে পর তাতে বিশেষ সুফলেরও আশা থাকে না। অতএব **প্রথম বয়সেই** এই সব সাধন আরম্ভ করা দরকার। সময়ের কাজ ঠিক সময়ে না আরম্ভ করলে কোন লাভ হয় না, বরং সমস্ত চেষ্টা যত্ন নিষ্ফল হয়ে পড়ে। যে কাজ যে সময়ে আরম্ভ করা দরকার, সে কাজ সে সময়ে আরম্ভ না করলে কখন সুফল লাভ হয় না। সাধকের সর্ব্বদা এ বিষয় মনে রাখা চাই এবং সাবধান হওয়া চাই যেন কখনও সঙ্কল্পিত কার্য্যে উদাসীনতা না এসে পড়ে। এই উদাসীনতা সাধকের পক্ষে মহাপ্রমাদ। সাধকের পক্ষে প্রমাদ সদা পরিত্যজ্য। কারণ, প্রমাদে পতন অনিবার্য্য। পক্ষান্তরে, অপ্রমাদে (সাবধানী হলে) উত্থান অবশ্যম্ভাবী।

সংসারের স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্মই হচ্চে সে সর্ব্বদা মায়াজাল বিস্তার ক'রে মনোরম দোকান সাজিয়ে সমস্ত জীবকে বাহ্য চাকচিক্যে ভুলিয়ে আপনার দিকে জোর আকর্ষণ করে; কেন না, জীব নিজের সহজসাধ্য চেষ্টা দ্বারা সংসাররূপী মায়াবিনীর হাত থেকে নিস্তার পায় না। কেবল যার পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত তপস্যা বেশি থাকে, সেই তপস্যাবলে সে সংসাররূপী বেশ্যার হাত থেকে নিস্তার পায়; অপরের সে সুবিধা নাই।

যে পার্থিব সম্পদের স্থায়িত্ব সম্বন্ধে বিশ্লেষণ পূর্ব্বক বিচার করতে অভ্যস্ত হয়, তত্ত্ববুদ্ধির বিকাশ হবার পর তার জিহ্বা উপস্থের ভোগ তৃষ্ণা সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে যায়। এটিই হচ্ছে এ বিষয়ের কষ্টি পাথর। এরকম পুরুষের চরিত্র অতি বিচিত্র; তাকে সংসারের জীব বুঝ্‌তে পারে না, বুঝবার শক্তিই নেই। তাঁর চাল-চলন, ভাব-ভঙ্গী সব অন্যপ্রকার হয়ে যায়। সংসারের সাধারণ মানুষ যে কাজ অবজ্ঞা করে, বিষয় ভোগে বিতৃষ্ণ পুরুষ সেই কার্য্য বিশেষ আগ্রহের

সহিত অনুষ্ঠান করেন। আবার এর বিপরীত, তিনি যে কাজ ঘৃণিত বুঝে করেন না, সাংসারিক পুরুষ পরমানন্দের সহিত সেই কার্য্যে দিন কাটায়। কদাচিৎ কারুর যদি ঐরূপ অবস্থা ঘটে, তবে সে আর সংসার কোলাহলের মধ্যে থাকা পছন্দ করে না। ঐরূপ বিষয় বিতৃষ্ণ পুরুষ নির্জ্জন বাসই অধিক পছন্দ করে। তখন সে মান-সম্ভ্রম-বোধ, দম্ভ-অহঙ্কার ত্যাগ করে অহিংসা সাধনে ব্রতী হয়ঃ ক্ষমা গুণে ভুষিত হয়; সরল পথে চল্‌তে থাকে; আচার্য্যের উপাসনা করে, অন্তর্বাহ্য শুদ্ধ হয়, ধৈর্য্য প্রাপ্ত হয়, ইন্দ্রিয় নিগ্রহে যত্নশীল থাকে তার বিষয়ে বৈরাগ্য জন্মে, অহঙ্কার বর্জ্জন তার চরিত্রগত হয়ে উঠে, সে জন্ম-মৃত্যু-জরা-ব্যাধি-দুঃখজনিত দোষ দেখিতে থাকে, দারা-পুত্র-গৃহাদিতে সক্তি ও অভিষঙ্গ ত্যাগ করে, ইষ্টানিষ্ট প্রাপ্তিতে সদা সমচিত্ত থাকে। ভগবানে তার অব্যভিচারিণী ভক্তি থাকে; সে নির্জ্জনে থাকৃতে ভালবাসে, সংসারাসক্ত জীবের সঙ্গ ত্যাগ কর্‌তে চায় (ভাল বাসে না), অধ্যাত্ম জ্ঞানলাভে যত্নশীল হয়, তত্ত্বজ্ঞানলাভের জন্য বেদান্ত দর্শনাদি পাঠ করে। গীতা ১৩ অ: ৮-১২।

সংসারের পার্থিব বস্তু যত ভালই হউক, যত হৃদয়গ্রাহীই হ'ক প্রেয় হলেও শ্রেয় কখনই নয়; আত্মজ্ঞানই শ্রেয় বস্তু। এই সংসারের অসংখ্য জীবের মধ্যে মনুষ্য শ্রেষ্ঠ জীব। অসংখ্য জীবের মধ্যে মনুষ্য ছাড়া আর কেউ শ্রেয়ঃপ্রাপ্তির জন্য চেষ্টা করে না। এ রকম মানুষের মধ্যে কেউ কেউ আত্ম-জ্ঞানের জন্য—আত্মজ্ঞান প্রাপ্তির জন্য চেষ্টা করে। হাজার জনের মধ্যে একজন পূর্ব্বজন্মের পুণ্যফলে আত্মজ্ঞান প্রাপ্ত হয়। আবার এরূপ আত্মজ্ঞান-প্রাপ্ত সহস্র মনুষ্যের মধ্যে কদাচিৎ কেউ পরমাত্মস্বরূপ যথার্থরূপে জেনে কৃতকৃত্য হয়। এ রকম পুরুষ সংসারে থাকৃলেও সংসারের আকর্ষণ থেকে অনেক দূরে তাঁরা থাকেন। এঁরা ছাড়া অপরে সংসারের মোহগর্ত্তে ঘটীযন্ত্রবৎ উঠানামা কর্‌তে থাকে। তাই সাধক চূড়ামণি রামপ্রসাদের মুখে শুন্‌তে পাই,—

এ সংসার ধোকার টাটী
সার শোনো এ কথাটি।
শাঁস নাই তার, খোসা আছে,
যেন একটি আমড়ার আঁটী।

তুমি গৃহস্থ, তুমি সংসারী; সুতরাং এ ভাব তোমার বুদ্ধিতে আস্‌বে না।

তুমি ইহা বুঝতে পারবে না। রামপ্রসাদ তত্ত্ববুদ্ধির আশ্রয়ে সংসারকে দিব্য দৃষ্টিতে দেখেছিলেন। তিনি বুঝেছিলেন, সংসারের সমস্ত বস্তু অন্তঃসার-শূন্য কোন বস্তুই স্থায়ী নয়। লোকে যেমন ভুল ক'রে দশের গণনায় নিজেকে বাদ দিয়ে ৯জন ক'রে থাকে, সংসারের সমস্ত পদার্থ সেইরূপ ভ্রমপূর্ণ, অর্থাৎ সত্য-বৎ প্রতীত হয় কিন্তু বাস্তবিক অস্তিত্বহীন।

যেমন রঙ্গমঞ্চে অভিনেতা আপনার স্বরূপ চেপে রেখে কেউ রাম, কেউ রাবণ, কেউ সীতা, কেউ হনুমান সেজে আসে, এবং আপনাকে ঐ ঐ নামে কল্পনা ক'রে অভিনয় দেখায়, সেইরূপ সংসারের সমস্ত পদার্থ আপন আপন স্বরূপ চেপে রাখে এবং অন্যমূর্ত্তি গ্রহণ ক'রে আমার সামনে হাজির হয়। এই অবস্থা আলোচনা ক'রে কোন কবি লিখেছেন,—

সংসার সঙের হাট মানুষের কর্ম্মভূমি
এ অনিত্য রঙ্গমঞ্চে অভিনেতা তুমি আমি।

বাস্তবিকই এ কথা খুবই সত্য; এই সংসার রঙ্গমঞ্চে অভিনেতাদের মত আমরা সকলেই (সমস্ত জীব) এই সাজের হাটে অভিনয় দেখাবার জন্য একত্র হয়েছি। আমি এ জন্মে যার পিতা, যার পুত্র, যার স্বামী হয়েছি, আগামী জন্মে আমি তার কেহই না হতে পারি অথবা যার পিতা ছিলাম, তার পুত্র হতে পারি। এতে স্পষ্টই বোঝা যায়, আমার এই জীবনের ক্ষণিক সম্বন্ধ পথের পথিকের পরিচয়ের সমান ক্ষণস্থায়ী। সংসারাসক্ত পুরুষ এ সম্বন্ধে আলোচনা দ্বারা সংসারের অসারতা বেশ ক'রে বুঝে ক্রমশঃ সংসারের প্রতি মমত্বের সঙ্কোচ করিতে চেষ্টা করিবে; তবেই তার জীবন-জন্ম সফল ও সার্থক হবে; নতুবা প্রবন্ধে লিখিত ধনবান গৃহস্থের মত বার বার তির্য্যক-যোনিতে জন্মগ্রহণ ক'রতে হবে। ওঁ শম্।

শান্তি আশ্রম,
চুচুঁড়া পোঃ।

৩০শে শ্রাবণ, ১৩৪৭।

মনের স্বরূপ বিচার

সাধক— আচ্ছা মন, তুই ভাই বড় দুষ্ট, বড় চঞ্চল, বড় পাজি, অতি প্রবল; তোর জ্বালায় আমি মরতে বসেছি ; তুই আমার যত অনিষ্ট করিস্, দুনিয়ায় এত অনিষ্ট আর কেউ করে না ; আমার অনিষ্ট করে তুই কি সুখ পাস্? আমার অনিষ্ট করে, আমায় নীচস্তরে নামিয়ে এনে তোর কি খুব আনন্দ হয়? আমাকে ধর্ম্মপথ থেকে বিচ্যুত করে তুই বুঝি খুব সুখী হস্!! ছি! মন, ছি!!!

মন—বাঃ সাধু, বেশ বল্‌ছত! কিসে আমি তোমার অনিষ্ট করলুম?

সাধক—শুন্‌তে চাও? তবে শোন ; হাটে হাঁড়ি ভাঙি তবে। কারুকে রাজ্যের লোভ দেখিয়ে গোলামি করাচ্ছ ; কারুকে ঐশ্বর্য্য-লালসায় মজিয়ে উচ্চ আদর্শ হ'তে ভ্রষ্ট করছ ; কারুকে টাকার লোভ দেখিয়ে ধনীর পা টেপাচ্ছ। যেমন কুকুরকে রুটির টুক্‌রো দেখিয়ে যতদূর ইচ্ছা নিয়ে যাওয়া যায়, তেমনি তুই বিষয়ভোগে আসক্ত ক'রে না জানি আমাকে কত কত জন্ম ধ'রে কত কত যোনিতে ঘুরিয়ে মারছিস্ ; তোর খর্পর থেকে পালাবার পথ দেখ্‌তে পাচ্ছিনা। তুই হাওয়ার চেয়ে বেশি জোরে দৌড়িস্ ; মুহূর্ত্তমাত্রে চৌদ্দ ভুবন বেড়িয়ে আস্‌তে পারিস্ ; জাগ্রত অবস্থায় ত নয়ই, স্বপ্নাবস্থায়ও তুই চুপ ক'রে বস্‌তে পারিস্ না ; জন্মে যার কথা জানি না শুনি নাই, এমন সব পদার্থ রচনা ক'রে থাকিস্ ; ভজন করতে বস্‌লে, আরো জোরে দৌড়ে পালাস্—আমি পূজায় বস্‌লাম, তুই চল্‌লি কোথায় নূতন গৃহশিক্ষক ছোট ছেলেকে আমার অসাক্ষাতে ভাল ক'রে পড়াচ্ছে কিনা ভাব্‌তে ; আমি জপে বস্‌লাম, তুই চল্‌লি আমার অনুপস্থিতিতে সোঁদালের জমি ভাল করে চষা খোড়া হল কিনা, সুন্দররূপে ধান রোওয়া হল কিনা ভাব্‌তে ; জপে বসে যতবার তোকে ধরে আনি, ততবার তুই কেমন পাশ কাটিয়ে ছুটে পালিয়ে যাস্, আমি জান্‌তেও পারি না ; আমি মন্ত্র চিন্তায় বস্‌লাম, তুই মাথামুণ্ডহীন কল্পনারাজ্য গড়তে বস্‌লি ; আমি ভগবানের ধ্যান করতে চাই, আর তুই সে সময় পালিয়ে পালিয়ে বেড়াস্ ; আমি ইষ্ট দেবতার নাম জপ করি, আর তুই গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়াস্ ; ভজনে বস্‌লাম যদি, অমনি তুই ঘর-বাহিরের যাবতীয় ঝগড়ার কথা নিয়ে হাজির কর্‌লি ; সব মাটি হয়ে গেল। তোর মত পাপীর হাত থেকে কবে মুক্তি পাব?

যখনি নিজের দিকে চেয়ে দেখি—একটু অন্তর্মুখী হই, অমনি দেখি, কোন না চিন্তায় তুই ডুবিয়ে রেখেছিস্; তুই যে এত ছেলেদের কথা ভাবিস্, সেই ছেলেরা কেমন তৈরী হচ্ছে দেখছিস্ কি? তাদের তেতলার উপর রেখে মাসে মাসে কুড়ি টাকা তাদের প্রত্যেকের পেছনে খরচ করছি, সকালে ৯টার সময় পাঁচ তরকারী ভাত একবাটি দুধ কোলের কাছে দিয়ে গেল ঠাকুর। বৈকালে সাড়ে চারিটার সময় গরম গরম লুচি তরকারি চাকর তেতলায় এনে মুখের কাছে ধরিল। রাত্রে আটটার সময় ৫ তরকারী ও একবাটি দুধের সঙ্গে গরম গরম রুটীর থালা প্রত্যেক ছেলের কোলে দিয়ে গেল; তার উপর মৃত সঞ্জীবনী ও মকরধ্বজ লেগেই আছে, তার উপর আমার দুটি চক্ষু C. I. D. পুলিশের মত তাদের পেছনে ঘুরছে কেন? যদি ছেলেরা মানুষ হয়, লেখাপড়া শেখে, চরিত্রবান্ হয়, দশের মধ্যে একজন হয়, দেশের চিন্তা দশের চিন্তা ক'রতে পারে, দুঃখীর দুঃখ অনুভব ক'রতে শেখে, স্বাবলম্বী হয়; কিন্তু ফল কি হচ্ছে জানিস্? গত পূজার ছুটীতে প্রায় এক বৎসরের পর দেশে গেলাম, পরিবারের জর ১০৪ ডিগ্রী, গা-হাত-পা কামড়াচ্চে, ছট্‌ফট্ ক'রছে; তাই দেখে বেলা দুইটার সময় মেজ ছেলেকে (এবার ম্যাট্রিক দেবে) বল্‌লাম 'তোর মায়ের হাত পাগুলো একটু টিপে দে'ত'; উত্তরে সে বল্‌ল—"আমার ঘুম পাচ্ছে আমি পার্‌ব না।" আর এই ছেলে—যখন ছোট ছিল এবং অসুস্থ হত, তখন ছেলের মা মশারির ভিতর বসে তিনটে বালিশ পেছনে ঠেশ দিয়ে সমস্ত রাত এই ছেলেকে কোলে ক'রে বিনিদ্র রজনী কাটিয়েছে; আজ মা অসুস্থ, ছেলে উপযুক্ত, আর সেই ছেলের মুখে এইকথা! মন, আর কেন তুই ছেলেদের কথা ভাবিস্? আর তাদের কথা ভাবিস্ না। সমস্তক্ষণই তুই একটা না একটা চিন্তায় ডুবিয়ে রেখেছিস্, একদিনও তুই সুখের ঘুম ঘুমুতে দিলি না; আমি সংসার থেকে মুক্ত হতে চাই, আর তুই আমাকে ফিরিয়ে ঘুরিয়ে সংসারেই ফেলে রাখিস্; ভূতের মত সদাই আমার ঘাড়ে চেপে রয়েছিস্; সৎসঙ্গে মিশতে চাইলে দাবাবড়ের নেশায় মজিয়ে রাখতে চা'স্; স্বাধ্যায়ে ব'সতে গেলে কতকগুলি উপন্যাস সামনে রেখে দিস্; গীতা পড়্‌তে ব'সলে অমনি বল্‌তে আরম্ভ করলি 'ঘরে ডাল নেই, ঘি নেই, মশলাপাতি ফুরিয়ে গেছে, একখানি কাঠ নেই, কয়লা ফুরিয়ে গেছে, বাজারে যাও, এখন গেলে ভাল মাছ সুবিধে দরে

পেতে পার, মাছ নইলে পরিবার যে ভাত খেতে পারেন না, ছেলেরাও সেই রকম; এখন বাজারে যাও, বাজার থেকে এসে গীতা পড়ে নিও, এতো রোজকার গীত, পেট-পূজাও ত প্রধান—সব চেয়ে বড় পূজা, আর সব তার নীচে; দেব-দেবীও খেতে-পেলে প্রসন্ন হন, গীতা পড়বার জন্য সারাদিন পড়ে আছে, রাত্রেও পড়্তে পার, বাজারের সময় বয়ে যাচ্ছে, যাও বাজারে যাও; তোর এইরকম যুক্তি শুনে শুনে আমি জালাতন পোড়াতন হয়েছি; তোর সর্ব্বনাশ হ'ক, তুই আমার সর্ব্বনাশ করেছিস্। স্বভাবতঃ আমি সুখী ছিলাম, তোর সঙ্গে পড়ে এখন দুঃখ পাচ্ছি; পবিত্র হয়েও তোর সঙ্গে পড়ে পাপী হয়ে পড়েছি; অচল হয়েও তোর কুহকে পড়ে সচল হয়ে পড়েছি; বৃহৎ হ'য়েও তোর প্রেমে পড়ে ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র—অনু হ'য়ে পড়েছি; অসঙ্গ হয়েও তোর পিরীতে প'ড়ে কর্ত্তা-ভোক্তার উপাধি আমার মাথায় চেপে বসেছে; স্বতন্ত্র ছিলাম, তোর পাল্লায় পড়ে এখন পরতন্ত্র হয়ে পড়েছি; মুক্ত ছিলাম তোর কথায় মজে এখন বন্ধন দশায় পড়েছি, বিষম বাঁধন—বাঁধনের উপর বাঁধন। তৃপ্ত ছিলাম, তোর কুহকে প'ড়ে এখন ক্ষুধা'র জালায় অস্থির হয়ে বেড়াচ্ছি; নির্ভর হয়েও তোর সঙ্গ করে এখন ভয়ে ভীত, জড়সড়; আমার জন্ম ছিল না, তোর পাল্লায় প'ড়ে এখন আমাকে জন্মাতে হচ্ছে; অমর ছিলাম তোর সঙ্গে পড়ে এখন মরণের কবলে কবলিত। কথায় বলে,

সৎ সঙ্গে স্বর্গবাস
অসৎ সঙ্গে নরকবাস।

আচ্ছা বল্ তুই, তোকে বিচারকের আসনে বসাচ্ছি, ন্যায় বিচার করে বল দেখি, আমি যা বললুম, তা সত্য কি না?

মন—বাহবা, সাধু, বাহবা! হয়কে নয় ক'রচো বেশ; ওকালতি চাল বেশ চাল্চো; স্রোত উল্টোদিকে বেশ বহাতে শিখেছ। যত দোষ, নন্দ ঘোষ!! যত গুলি দোষ আমার ঘাড়ে চাপিয়েছ, তার একটাও সত্য নহে। আমার কোন দোষ নেই, দোষের মূল পর্য্যন্ত নেই। বিচারে টেঁকে না। মিথ্যা অপরের ঘাড়ে দোষ চাপান মহাপাপ। ভেবে চিন্তে ব'লতে হয়, বিচার করে বল্তে হয়। তুমি ভাল, আর আমি বড় মন্দ। মন্দ ভালকে খারাপ করে

দেয়—জগতে এরকম হতে দেখেছ ? গুরুর কাছে কি এমন কথা কখন শুনেছ ? রোজ ত শুনি, মন্দ মন্দই থাকে, ভাল ভালই থাকে, মন্দ কখন ভাল হয় না, ভাল কখন মন্দ হয় না ; যেমন দিন-রাতের মধ্যে কখন মিল হয় না, তেমনি ভাল-মন্দের মধ্যে কখন মিল হতে পারে না ; সোণা কখন লোহা হতে পারে না। যেমন কারণ, তেমনি কার্য্য—এটাই জাতের নিয়ম। স্বজাতীয়ের স্বজাতীয়ের সহিত মিল হয়, বিজাতীয়ের সহিত কখন মিল হতে পারে না। তবে আমি তোমাকে সুখ হইতে কিরূপে বঞ্চিত করিলাম ? সুখী ছিলে, দুঃখী করিলাম কিরূপে ? তুমি আমাকে দুষ্ট, চঞ্চল, বলবান্ বলেছ, আমি কিন্তু এর একটাও নই। আর যদি হই, ত তুমি আমাকে সেইরূপ বানিয়েছ বলে হয়েছি। আমি ত সরল, অবল, খোঁড়া ; আমি তোমার বিনা পয়সার চাকর, আমাকে ত তুমি দাম দিয়ে কিনে আন নাই, বিনা দামে কেনা গোলাম। কথায় আমাকে বেঁধে রেখেছ ; তোমার ইসারায় আমি কাজ করে যাই ; তুমি যে জিনিষ চাও, আমি তাই এনে দেই ; যেখানে দাঁড়িয়ে থাক্‌তে বল, ঠিক সেইখানেই সোজা দাঁড়িয়ে থাকি, একটুও নড়ি চড়ি না। তোমার রুচি অনুসারে কাজ করে থাকি ; তোমার রুচি না হলে সে কাজ কখন করি না। তুমি যখন চল্‌তে বল, তখনই চল্‌তে থাকি, যখন দৌড়ে যেতে বল, তখন দৌড়াই; তোমায় দেওয়া পায়ে ভর করেই দৌড়াই! আমার ত পা নাই, আমি ত খোঁড়া ; আমি ত জড়, আমার বলও নাই, আর যদি থাকে, সে ত তোমারই দেওয়া—আমি ত বলহীন। অবলার পুত্রের বল আস্‌বে কোথা থেকে ? তোমার বিপরীত বুদ্ধি হয়ে গেছে ; তোমাকে বুঝিয়ে দেওয়া দরকার হয়েছে। একচোকা হয়ে বিচার করো না। পক্ষপাত রহিত হয়ে বিচার কর স্বভাবতঃই তুমি ভাল, নির্দ্দোষ। আমি তোমাকে দোষী ব'লছি না ; আমি স্বীকার ক'রছি, তুমি নির্দ্দোষ। কিন্তু আমিও দোষী নহি। আর যদি হই তবে তুমি আগে দোষী হয়েছ। কারণ থেকে কার্য্য ভিন্ন হয় না। তুমি যেমন হয়েছ, আমিও তেমনি হয়েছি ; তোমা থেকেই ত আমার উৎপত্তি। আমি ত আকাশ থেকে হঠাৎ এসে হাজির হই নাই ; তুমি আমাকে তৈরী করেছ, বানিয়েছ, রূপ দিয়েছ ; তুমি এসে আমার সঙ্গ করেছ ; যে যে ভোগ তুমি চেয়েছ, আমি সে সকল এনে হাজির করে দিয়েছি। যে যে যোনি তুমি

পছন্দ করেছ, আমি সেই সেই যোনিতে তোমাকে নিয়ে গেছি; তুমি বল্‌ছ আমি ভজন কর্‌তে দেই না। ভজন ক'রতে তুমি কখন চাও ? স্ত্রী, পুত্র, পরিবার, টাকাকড়ি, ঐশ্বর্য্য, নাম, কীর্ত্তি, ঋদ্ধি-সিদ্ধি, জুয়াচুরি, ব্যভিচার, মাংস, মদ, চুরুট, আফিম্‌, সুমিষ্ট খাদ্যদ্রব্য—এই সকলেই ত তোমার রুচি; এদের ছেড়ে তোমার ফুরসদ্‌ কোথায়? ভজনের সময় কৈ? দিন রাত ত এদেরই ভজন ক'রছ; ঈশ্বরের ভজন কোথা থেকে হবে? যা খাবে, তারিরই ত ঢেঁকুর উঠ্‌বে। ফনোগ্রাফে যে রাগ গাইবে, সেই রাগ বেরুবে। তোমার যেমন রুচি হবে, আমার তেমনি গড়ন হ'বে। তোমার রুচি অনুযায়ী আমার দেহ গড়ে উঠে। আমি ত চাকর মাত্র; চাকরের আবার তেজ কি? "জী হাঁ" করাই চাকরের কাজ। সংসারীর চাকর, নির্গুণের ত চাকর নাই। সংসারী যখন নির্গুণের প্রশংসা ক'রবে, নির্গুণ হ'তে চাইবে, তখন তাকে নির্গুণের পথে নিয়ে যাব। সংসারী যখন নির্গুণ পথ পছন্দ করে না, তখন আমি তাকে সে পথে নিয়ে যাই না। বেশ ত, আপনি সৎ হ'বেন, সৎপথে চলবেন, চলুন না; আমি তাতে বাধা দিব কেন? আপনি স্বাধ্যায় করুন, প্রণিধান করুন, আসন লাগান, প্রাণায়াম করুন। প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান, সমাধি করুন। ইষ্টদেবের নাম জপ করুন, পরাভক্তি সাধুন; শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন করুন; শিব, কৃষ্ণ, রামের মূর্ত্তির ধ্যান করুন—বেশ কথা; যা ক'রবেন, প্রেমের সহিত করুন, প্রাণের স্পর্শ দিয়ে সেটা করুন। আপনি স্বতন্ত্র; আমি আপনাকে রুক্‌তে পারি? আমি রোক্‌বার কে? আমার কান ত আপনি ধরে রয়েছেন, যে দিকে টানবেন সে দিকে যাব। আপনি সংসার থেকে মুক্ত হ'তে চান, বেশ ত, আমাকে হুকুম দিয়ে দিন আমি ঘরে বসে পড়ি, আমার ছুটোছুটি ক'রবার কি দরকার? চাকর ত জড় জমি থেকে সাড়ে তিন হাত উঁচু; যে দিকে যেখানে আপনি আমাকে চুপ করে বস্‌তে বলবেন, আমি ঠিক সেইখানে সেই দিকে চুপ করে বসে প'ড়ব। পরমাত্মার ধ্যান করুন, আপনি মুক্ত হয়ে যান। বড় আনন্দের কথা। আপনি মুক্ত হয়ে গেলে আমিও মুক্ত হয়ে যাব। আপনার আশ্রয়েই ত আমি আছি, আপনার সঙ্গে আমারও মুক্তি হয়ে যাবে;

যদি সত্য কথা বলতে হয়, ত মুক্তি ত আমারই হবে, আপনি ত স্বভাবতই মুক্ত।

সাধক—একান্তে গিয়ে ভেবে বললে, মন ত ঠিক কথাই বলেছে। পুরুষের ছায়া যেমন, জীবের মনও ঠিক তেমনি। পুরুষ যেমনটি দেখ্‌তে, ওর ছায়াও ঠিক তেমনিটি। আমি যেমন, আমার মনও সেই রকম; মন যেমনটি বলেছে, সেটা ঠিক কথা, সত্য কথাই বলেছে। আমিই উহার সত্তা দিয়ে রেখেছি, নতুবা ও বেচারীর সত্তাই থাকে না! ও তো সত্যই আমার চাকরই বটে; ওর আপন সত্তা ত কিছুই নেই। সে প্রায় সব কাজই আমার ইচ্ছানুসারেই করে থাকে। কোন কাজ যদি আমি না করাই ত সে আলাদা কথা। এই হ'তে বেশ বোঝা যাচ্ছে, মন আমার ছায়া মাত্র, চাকর মাত্র, জড়; আর আমি স্বতন্ত্র কর্ত্তা, চেতন বস্তু। আমি মনের অধীন নহি, মন আমার অধীন।

এইটুকু জান্‌তে পারলেই, অনুভূতির ভিতর দিয়ে উপলব্ধি করতে পারলেই, সাধক সুখী হয়। আয়ু পর্য্যন্ত মনের কাছ থেকে ইচ্ছানুরূপ কাজ আদায় করে লয়, তারপর অন্তে ওকে জন্মশোধ ছেড়ে দিয়ে স্ব স্বরূপে স্থিত হয়ে চিরকালের জন্য জন্মমরণরূপ সংসার হ'তে মুক্ত হয়ে ব্রাহ্মীস্থিতি প্রাপ্ত হয়। অজ্ঞান হ'তেই সব দুঃখ। মনকে মনরূপে বু'ঝলেই মন স্বাধীন হ'য়ে পড়ে। মনের স্বরূপ না বুঝ্‌তে পারলেই মন চল্লিশ সের ভারী হয়ে দাঁড়ায়, আর বুঝতে পারলে ছটাক ভর ও হয় না; তোলাভর নয়, এক মাষাও নয়, এক রতিও নয়। তখন ফুঁ দিলেই উড়ে যায়। সত্য কথা বল্‌তে গেলে তখন ফুঁএরও দরকার হয় না। পাদ-মস্তকহীন কবন্ধ বিশেষ। যখন মনের স্বরূপ বুঝ্‌তে পার্‌লে, তখন ভূঃ স্বাহা হয়ে গেল। স্বয়ম্ভুই শেষ পর্য্যন্ত থেকে যায়। ওঁ শম্।

আত্মজ্যোতির স্বরূপ বিচার

প্রত্যেক পরিণামশীল বস্তুর সত্তা আপেক্ষিক, নির্ব্বিশেষ নহে; প্রত্যেক পরিণামী বস্তু আপনা অপেক্ষা কম পরিণামী বস্তুর তুলনায় পরিণামী। ঐ পরিণামী বস্তুর সত্তা আপেক্ষিক। এই প্রকার বিচারের সূত্রাবলম্বনে প্রত্যেক

বস্তুর সত্তাই আপেক্ষিক ; সকল বস্তুই যখন আপেক্ষিক সত্তাবিশিষ্ট তখন সকল বস্তুর মূলে এমন এক আপেক্ষিক সত্তাবিহীন নির্ব্বিশেষ মূল কারণ বিদ্যমান আছে, যিনি নিত্য, পূর্ণ, অজর, অমর, ও পরিণামহীন এবং যাঁর উপর সমস্ত পরিণামশীল, অনিত্য, অপূর্ণ ও দেশ-কাল পরিচ্ছন্ন সত্তার স্থিতি নির্ভর করে। ঐ পরিণামহীন সর্ব্বতঃ পূর্ণ নিত্য সত্তা হচ্চে সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম। উঁহারই পরিণামহীন সৎ-সত্তার উপর নিখিল প্রপঞ্চের পরিণামশীল আপেক্ষিক সৎসত্তা নির্ভর করে এবং উঁহারই পরিণামহীন সুখ-দুঃখ-দ্বন্দ্বরহিত আনন্দ সত্তার আধার আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত প্রত্যেক জীব হৃদয়ে কর্ম্মের মূল কারণরূপ পরিণামশীল বিয়োগ-দুঃখপূর্ণ সুখ-সত্তার বিবিধ বিলাস কলা প্রত্যক্ষ দেখিতে পাওয়া যায়। এইরূপে অপরিণামী পূর্ণ এবং নিত্য পরমাত্মার সৎ চিৎ ও আনন্দ সত্তার উপর দৃশ্য প্রপঞ্চের আপেক্ষিক সত্তা (পরিণামী সৎ-সত্তা, জ্ঞান-সত্তা এবং আনন্দ-সত্তা) নির্ভর করে ; পরন্তু তাঁহার সৎ-চিৎ-আনন্দ-সত্তার বিকাশের জন্য অন্য সত্তার অপেক্ষা রাখে না। তাই কেনোপনিষদে দেখিতে পাই ;—

যদ্ বাচা নাভ্যুদিতং যেন বাগভ্যুদ্যতে।
তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে ॥

যাঁর স্বরূপ বাক্যের দ্বারা প্রকাশ করা যায় না, কিন্তু যাঁকে অবলম্বন ক'রে বাক্ শক্তি স্ফূর্ত্তি পায়, তিনিই পরব্রহ্ম। মন যাঁর স্বরূপ মনন ক'রতে পারে না, যাঁর কাছ থেকে মন তার মনন শক্তি পেয়েছে, সেই পরম পুরুষই হচ্চেন ব্রহ্ম। চক্ষু যাঁর কাছে দর্শনশক্তি পেয়েছে, কর্ণ যাঁর কাছে শ্রবণ শক্তি পেয়েছে, প্রাণ যাঁর কাছে প্রাণশক্তি পেয়েছে, তিনিই পরব্রহ্ম।

ন তত্র সূর্য্যো ভাতি, ন চন্দ্রতারকং
নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ।
তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বম্
তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি ॥ কঠোপনিষৎ।

সূর্য্য চন্দ্র, নক্ষত্র বা বিদ্যুৎ কেহই পরমাত্মার স্বরূপ প্রকাশ করতে পারে না ; তাঁরই জ্যোতিতে চন্দ্র সূর্য্যাদি জ্যোতির্ম্ময়, এবং সংসার আলোকিত। সৈন্ধবের ভিতর বাহির সবই যেমন লবণময়, আত্মারও ভিতর বাহির সবই তেমনি জ্ঞানময়। তাঁরই চিৎ-সত্তার আধ্যাত্মিক-বিলাস জ্ঞানরূপে বেদ দ্বারা

প্রকাশিত ; অধিদৈব বিলাস শক্তিরূপে সূর্য্যাত্মা দ্বারা প্রকাশিত এবং অধিভূত বিলাস স্থূল জ্যোতিরূপে সূর্য্য-গোলক দ্বারা প্রকাশিত। তাই গীতায় দেখিতে পাই—

ন তদ্ ভাসয়তে সূর্য্যো ন শশাঙ্কো ন পাবকঃ।
যদ্ গত্বা ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম ॥
যদাদিত্যগতং তেজো জগদ্ভাসয়তেঽখিলম্।
যচ্চন্দ্রমসি যচ্চাগ্নৌ তত্তেজো বিদ্ধি মামকম্।

পরমাত্মার সেই পরম পদে একবার পৌঁছুলে সাধকের আর সংসারে ফিরে আস্‌তে হয় না ; পরমাত্মার সেই পরম পদ সূর্য্য চন্দ্র বা অগ্নি প্রকাশ ক'রতে পারে না ; কেন না, তিনি (পরমাত্মা) স্বয়ং প্রকাশ এবং সমস্ত প্রকাশের আকর। সূর্য্যের যে প্রচণ্ড তেজ যাহা বিশ্বকে প্রকাশ ক'রছে, চন্দ্রের তেজ বা অগ্নির তেজ,—এই সমস্ত তেজ পরব্রহ্ম পরমাত্মার জানিবে। সংসারের জাগ্রতাবস্থাগত স্থূল-তেজই বল, স্বপ্নাবস্থাগত মনোভ্রমণকারী সূক্ষ্ম-তেজই বল, বা সুষুপ্তি অবস্থায় কারণশরীর-প্রতিবিম্বিত আভাস-চৈতন্যের আনন্দময় মধুর তেজই বল,—সব তেজই শ্রীভগবান সচ্চিদানন্দের অনন্ত তেজের কণামাত্র দ্বারা প্রতিফলিত তেজ মাত্র।

বৃহদারণ্যকোপনিষদে দেখিতে পাই,—

অস্তমিত আদিত্যে যাজ্ঞবল্ক্য চন্দ্রমস্যস্তমিতে শান্তেঽগ্নৌ শান্তায়াং বাচি কিং জ্যোতিরেবায়ং পুরুষ ইত্যাত্মৈবাস্য জ্যোতি র্ভবতীত্যাত্মনৈবায়ং জ্যোতিষাঽঽস্তে, পল্যয়তে, কর্ম্ম কুরুতে, বিপল্যেতীতি।

চন্দ্র-সূর্য্য অস্ত যাবার পর অগ্নির জ্যোতিতে (প্রদীপ, হারিকেন, বিজলীবাতি ইত্যাদি) কাজ করা যেতে পারে ; অগ্নিও শান্ত হয়ে গেলে (নিবে গেলে) বাক্য-জ্যোতি দ্বারা দিক্ নির্ণয়াদি কাজ চল্‌তে পারে। গভীর রাত্রিতে স্বপ্ন দর্শনের সময় সূর্য্য, চন্দ্র, অগ্নি বা আর কোন জ্যোতি না থাকলেও জীব যে এ দেশে ও দেশে যাতায়াত করে, এবং বিচিত্র স্বপ্ন-নগরীর শোভা দেখিতে থাকে, সে সময় কেবল হৃদয়গুহায় ভাসমান আত্মার জ্যোতিই কার্য্য করিতে থাকে ; অন্য কোন জ্যোতি থাকে না। তবেই দেখ, জাগ্রৎ, স্বপ্ন এবং সুষুপ্তি দশায় আত্ম-জ্যোতিই সর্ব্বথা জীবের একমাত্র অবলম্বন। ইহাতে আর সন্দেহ নাই।

শ্রীভগবানের ওই স্বয়ং-প্রকাশ, গুণাতীত, দেশ-কাল-বস্তু দ্বারা অপরিচ্ছিন্ন সৎ, চিৎ এবং আনন্দ-সত্তা অঘটন-ঘটনা-পটীয়সী ত্রিগুণময়ী মায়া দ্বারা বিবিধ পরিচ্ছিন্ন ও পরিণামী রূপে সমস্ত দৃশ্য সংসারে পরিব্যাপ্ত রহিয়াছেন। তাঁহার অদ্বিতীয় সৎ-সত্তা মায়া দ্বারা নানা জীব-সত্তা তথা জগৎ-সত্তারূপে প্রকাশমান রহিয়াছেন। তাই শ্রুতিতে দেখিতে পাই,—রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব তদস্য রূপং প্রতিচক্ষণায় ইন্দ্রো মায়াভিঃপুরুরূপ ইয়তে।

অগ্নি র্যথৈকো ভুবনং প্রবিষ্টো
রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব।
একস্তথা সর্ব্ব ভূতান্তরাত্মা
রূপং রূপং প্রতিরূপো বহিশ্চ। —কঠোপনিষৎ।

একরূপ পরমাত্মা মায়া দ্বারা বহুরূপ ধারণ ক'রে সংসারের দৃশ্যমান সমস্ত বস্তুরূপে বিভক্ত হইয়া রহিয়াছেন। যেমন এক অগ্নি সংসারে প্রকাশ হ'য়ে অনেকরূপ ধারণ ক'রে থাকে, সেইরূপ পরমাত্মা মায়া দ্বারা আপনার অদ্বিতীয় সৎ-সত্তাকে বিশ্বপ্রপঞ্চ মধ্যে অনন্ত সত্তারূপে বিভক্ত ক'রে দিয়া থাকেন।

এইরকমে পরমাত্মার সৎ-সত্তা দ্বারা অনন্ত জীব-সত্তার বিস্তার হ'য়ে থাকে। সেইরূপ তাঁহার চিৎ-সত্তা ত্রিগুণময়ী মায়া দ্বারা বিবিধ জ্ঞানরূপে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে বিলসিত হয়। মায়ার সত্ত্বগুণময় বিদ্যাভাবে প্রতিবিম্বিত ওই চিৎ-সত্তা আধ্যাত্মিক জ্ঞানরূপে মুমুক্ষুজনের হৃদয়াকাশে প্রকাশিত হ'য়ে উহাকে নিঃশ্রেয়স পদে প্রতিষ্ঠিত করে। মায়ার রজোগুণময়ী পরিণামিনী স্থিতি-দশায় প্রতিবিম্বিত হ'য়ে ওই চিৎ-সত্তা বিবিধ শিল্প, কলা, বিজ্ঞানাদি শাস্ত্ররূপে আপনার অপূর্ব্ব ছটা বিস্তার ক'রে থাকেন। মায়ার তমোগুণময়ী অবিদ্যা-বিলসিত-ভূমিতে প্রতিফলিত হ'য়ে ওই চিৎ-সত্তা বিবিধ তামসিক জ্ঞানরূপে জগতকে মুগ্ধ ক'রে থাকেন। এই প্রকারে তটস্থ লক্ষণযুক্ত যাবতীয় ব্যবহারিক জ্ঞান, ত্রিগুণ-তরঙ্গ প্রতিবিম্বিত তথা গুণমিশ্রণজনিত অবান্তর-তরঙ্গ-প্রতিফলিত অনন্তজ্ঞান, এবং স্বরূপাভিমুখীন সমস্তজ্ঞান ওই জ্ঞানরূপ পরম পুরুষ অদ্বিতীয় পরমাত্মার চিৎ-সত্তার মায়াবলম্বিনী বহি-র্বিলাস কলারূপে সমস্ত দ্বৈত-সত্তার অসংখ্য ভাবকে আশ্রয় ক'রে বিশ্ব সংসারে বিকাশপ্রাপ্ত হ'য়ে রয়েছেন। তাই ভগবান গীতামুখে বলিয়াছেন,—

বুদ্ধির্জ্ঞান-মসংমোহঃ ক্ষমা সত্যং দমঃ শমঃ।

* * *

ভবন্তি ভাবা ভূতানাং মত্ত এব পৃথগ্ বিধাঃ।

বুদ্ধি, জ্ঞান, অসংমোহ, ক্ষমা, সত্য, দম ও শমাদি জীবরাজ্যগত সমস্ত ভাব আমা হ'তেই উৎপন্ন হয়।

সর্ব্বস্য চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টো
মত্তঃ স্মৃতিজ্ঞানমপোহনং চ।
বেদৈশ্চ সর্ব্বৈরহমেব বেদ্যো
বেদান্তকৃদ্ বেদবিদেব চাহম্।

আমি সকলের হৃদয়ে বাস করি; আমা হ'তেই স্মৃতি জ্ঞান বা তাহাদের অভাব প্রকাশ পায়। সকল বেদের বেদ্য বস্তু 'আমি' এবং বেদের কর্ত্তা বা বেদের যথার্থ অর্থ বেত্তাও আমিই; ইহা দ্বারা নিষ্পন্ন হচ্চে যে, পরমাত্মার চিৎ-সত্তা ত্রিগুণময়ী মায়ার ভিন্ন ভিন্ন ভাব-প্রবাহে প্রতিবিম্বিত হ'য়ে বিশ্বজগতের বিবিধ জ্ঞানরূপে জীব-কেন্দ্র দ্বারা প্রকাশিত হন। সেইরকম তাঁর আনন্দ-সত্তা ও ত্রিগুণময়ী প্রকৃতি দ্বারা প্রতিফলিত হ'য়ে প্রকৃতিজাত জীব জগতে বিবিধ বিষয়-সুখরূপে সুপ্রকাশিত। তাঁহার স্বরূপগত আনন্দ নানাত্ব-ভেদহীন, সুখদুঃখাতীত, অখণ্ড ও নিত্য। তাই শ্রুতি মুখে শুনিতে পাই—

"নানাত্বভেদহীনোঽস্মি সুখণ্ডানন্দবিগ্রহঃ"

পরমাত্মা অদ্বিতীয় ও অখণ্ড আনন্দ স্বরূপ। পরন্তু পরিণামিনী প্রকৃতি দ্বারা যখন ওই আনন্দ সংসারে প্রবাহিত হয়, সে সময় প্রকৃতির ত্রিগুণ সম্বন্ধের কারণ দুঃখসঙ্কুল বিষয়-সুখরূপে ওই আনন্দের বিবিধ বিলাস দেখা যায়; যে আনন্দ-বিলাস জীব আপন আপন প্রকৃতি অনুযায়ী নানা প্রকার সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক সুখরূপে উপভোগ ক'রে থাকে। শ্রুতিও বলিয়াছেন,—

"রসো বৈ সঃ। রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বাঽঽনন্দী ভবতি।" তৈত্তিঃ উপঃ।

"এষোঽস্য পরম আনন্দ এতস্যৈবানন্দস্যান্যানি ভূতানি মাত্রামুপজীবন্তি।
ইতি বৃহদারণ্যক উপঃ।

'পরমাত্মা আনন্দ স্বরূপ; তাঁর আনন্দ-সত্তা লাভ ক'রেই সমস্ত জীব আনন্দিত হয়। বিকারহীন সুখ-দুঃখ-দ্বন্দ্বহীন পরমানন্দের স্থিতি তাঁহাতেই সম্ভব এবং তাঁরই আনন্দ-সত্তার যৎসামান্য অংশ বিষয়সুখরূপে প্রকৃতি দ্বারা প্রাকৃতিক জীব সংসারে উপভোগ ক'রে থাকে।"

পতি-পত্নীর হৃদয়ে পারস্পরিক প্রেমের মধুর আনন্দ, মিত্রের হৃদয়ে এক-প্রাণতার পবিত্র আনন্দ, মাতাপিতার হৃদয়ে নিষ্কলঙ্ক স্নেহ ও বাৎসল্য-জনিত উদার আনন্দ, কাম-মোহ লোভাদি বিষয়-পাশবদ্ধ বিষয়ী-লোকের হৃদয়ে দুঃখপরিণামদগ্ধ বিবিধ বিষয়ানন্দ ইত্যাদি সকল প্রকার আনন্দ অনন্ত আনন্দের নিত্যপ্রস্রবণরূপ পরমাত্মার আনন্দ-সত্তার বিন্দুমাত্র লইয়া ত্রিগুণময়ী মায়া দ্বারা অনিত্য সুখরূপে সংসারে বিলসিত হ'য়ে রয়েছে।

সেই মায়াতীত সৎ, চিৎ ও আনন্দরূপ পরমাত্মার মায়া দ্বারা নানা ভাবে সংসারে বিকসিত হওয়াই তাঁর মহিমা; সেই মহিমা সম্যক্ পরিজ্ঞানে সান্ত জীব আপন অনন্ত সত্তার উপলব্ধি ক'রে দুঃখ দাবানলদগ্ধ সংসার হ'তে মুক্তি-লাভ করতে সমর্থ হয়। পরমাত্মার স্বরূপ তথা তাঁর উপর জাগতিক সমস্ত সত্তার নির্ভরতা বর্ণনা প্রসঙ্গে ছান্দোগ্য উপনিষৎ বলিতেছেন,—

"যো বৈ ভূমা তদমৃতমথ যদল্পং তন্মর্ত্যম্।
স ভগবঃ কস্মিন্ প্রতিষ্ঠিত ইতি। স্বে মহিম্নি।
"সন্মূলাঃ সোম্যেমাঃ সর্ব্বাঃ প্রজাঃ সদায়তনাঃ সৎপ্রতিষ্ঠাঃ।"

"আত্মতঃ প্রাণ আত্মত আশাহঽত্মতঃ স্মর আত্মত আবির্ভাব-তিরো-ভাবামাত্ম-তোঽন্নমাত্মতো বলমাত্মেতো বিজ্ঞানমাত্মতো ধ্যানমাত্মত শ্চিত্ত-মাত্মতঃ সঙ্কল্প-মাত্মতো মন আত্মতো বাগাত্মতো নামাত্মতো মন্ত্রা আত্মতঃ কর্ম্মাণ্যাত্মত এবেদং সর্ব্বম্।"

পরমাত্মার যে ব্যাপক আনন্দ, ইহাই নিত্য ও শাশ্বত; আর মায়ামুগ্ধ হইয়া বিষয় হইতে যে আনন্দ পাওয়া যায়, উহা অল্প, অনিত্য ও ক্ষণভঙ্গুর। আনন্দরূপ পরমাত্মার সত্তা অন্য কাহারও উপর নির্ভর করে না, উহা স্বয়ং প্রকাশ, স্বয়ং আনন্দ এবং স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত। পরমাত্মার সত্তা, অন্য কারুর উপর নির্ভর না করলেও সমস্ত সৃষ্টি ও সমস্ত জীবের সত্তা তাঁর উপর নির্ভর করে। সমস্ত সৃষ্টির মূল পরমাত্মার সত্তা; সমস্ত জীবের স্থিতি পর-মাত্মার স্থিতির উপর নির্ভর করে। কেবল এই মাত্র নহে; প্রত্যুত সংসারে এমন কোন বস্তু, এমন কোন জ্ঞান, এমন কোন শক্তি, এমন কোন প্রকাশ, স্থূল-সূক্ষ্ম কারণ প্রকৃতির অন্তর্গত এমন কোন সত্তা তাই, যার উৎপত্তি আত্মা থেকে হয় নাই। আত্মা হ'তেই প্রাণের উৎপত্তি; আত্মা হ'তেই আশার

উৎপত্তি ; আত্মা হ'তেই স্মৃতি, আকাশ, তেজ, ও জলের উৎপত্তি ; আত্মা হ'তেই সমস্ত সৃষ্টির আবির্ভাব তিরোভাব ঘটে থাকে। আত্মা হ'তেই অন্ন, বল, বিজ্ঞান, ধ্যান, চিত্ত, সঙ্কল্প, মন, বাণী, নাম, মন্ত্র, কর্ম্ম, সমস্ত উৎপন্ন হইয়া থাকে।

বৃহদারণ্যক উপনিষদে দেখিতে পাই,—

"যথা উর্ণনাভেঃ তন্তবঃ ব্যুচ্চরেয়ুঃ যথা অগ্নেঃ ক্ষুদ্রা বিস্ফুলিঙ্গা ব্যুচ্চরন্তি এবমেব অস্মাদ্ আত্মনঃ সর্ব্বে প্রাণাঃ সর্ব্বে লোকাঃ সর্ব্বে দেবাঃ সর্ব্বাণি ভূতানি ব্যুচ্চরন্তি।"

মাকড়সা যেমন আপন মুখ থেকে যত ইচ্ছা সুতা বাহির করিয়া জাল বুনে, আগুন থেকে যেমন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্ফুলিঙ্গ বাহির হয়, সেই রকম পরমাত্মা থেকে সমস্ত প্রাণ, সমস্ত লোক, সমস্ত দেবতা, সমস্ত ভূতগণ উৎপন্ন হয়।

এই রকমে পরমাত্মা হইতে স্বাভাবিক ভাবে সমস্ত সৃষ্টির যে কেবল বিকাশ হয়েছে, তা নয়, তাঁতেই সকলের স্থিতি এবং তাঁতেই সকলের লয় হয়। তাই তৈত্তিরীয় উপনিষদ্ বলিতেছেন,—

"যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে, যেন জাতানি জীবন্তি, যৎপ্রয়ন্তি অভিসংবিশন্তি।

পরমাত্মা হইতে সকল ভূতের উৎপত্তি, পরমাত্মাতেই তাদের স্থিতি, পরমাত্মাতেই সকল ভূতের লয় হয়।

ছান্দোগ্য উপনিষদ্ বলিতেছেন,—

সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম তজ্জলানিতি শান্ত উপাসীত।"

সমস্ত সংসার ব্রহ্মময় এবং ব্রহ্ম হইতে নিখিল জগতের উৎপত্তি, তাঁহাতেই স্থিতি, তাঁহাতেই লয় হয়। এই জন্যই ব্রহ্মের উপাসনা করা দরকার। এই শ্রুতির "তজ্জলান্" শব্দের অর্থ হচ্চে তজ্জ, তদন" অর্থাৎ ব্রহ্ম হ'তেই জগতের উৎপত্তি, উহাতেই স্থিতি, এবং উহাতেই সমস্ত সংসার লয় প্রাপ্ত হয়। মায়ার প্রভাবে সচ্চিদানন্দময় পরমাত্মাতে বিশ্ব স্থিতি একটা বিরাট রহস্য! দৈব-লীলা!! আশ্চর্য্য যাদুময়!! ইহারই নাম আত্মজ্যোতি, ইহারই নাম ব্রহ্ম জ্যোতি। ইনিই জ্যোতি র্জ্যোতি স্বয়ং জ্যোতি।

অন্তর্জ্যোতি বহির্জ্যোতিঃ প্রত্যক্‌জ্যোতিঃ পরাৎপরঃ।
জ্যোতির্জ্যোতিঃ স্বয়ং জ্যোতি-রাত্মজ্যোতিঃ সারাৎসারঃ।

শান্তি-আশ্রম, চুচুড়া পোঃ। ৮ই ভাদ্র, ১৩৪৭ সাল।

মুক্তির স্বরূপ বিচার

অঃ

আত্মা সুখ-স্বরূপ। প্রাণীমাত্রেই সুখী হইবার ইচ্ছা করে, দুঃখী হ'তে কেউ চায় না। 'সুখং মে ভূয়াৎ, দুঃখং মে মাস্ম ভূৎ'—আমার কেবলমাত্র সুখ হ'ক, আমাকে দুঃখের অনুভব যেন কখনও করতে না হয়। ইহাই জীবমাত্রেরই ইচ্ছা। অনুকূল অনুভবের নাম সুখ, আর প্রতিকূল অনুভবের নাম দুঃখ। শাস্ত্রে আছে,—"অনুকূল-বেদনীয়ং সুখম্; প্রতিকূলবেদনীয়ং দুঃখম্।" আপন আপন অবস্থায় কেহই সন্তুষ্ট নহে; যে যে অবস্থায় আছে, সে সে অবস্থায় সন্তুষ্ট নহে। যার একশ' টাকা আছে, সে হাজার টাকা চায়; যার হাজার টাকা আছে, সে লক্ষ টাকা চায়; যার লক্ষ টাকা আছে, সে কোটী টাকা চায়; যার কোটী টাকা আছে, সে রাজা হ'তে চায়; যে রাজা, সে রাজচক্রবর্ত্তী হ'তে চায়; যে রাজচক্রবর্ত্তী, সে ইন্দ্রত্ব পেতে চায়। তবেই দেখ, যে যতটুকু সুখ পায়, তার চেয়ে আরও অধিক সুখ সে পেতে চায়; অল্পে কেহই সন্তুষ্ট নয়। শ্রুতিও ব'লছেন,—"নাল্পে সুখমস্তি; ভূমৈব সুখম্।" (অল্পে সুখ নাই, অসীমই সুখস্বরূপ)। এর তাৎপর্য্য হচ্চে যে, জীবমাত্র সকলেই নিরবধি ও নিরতিশয় সুখ চায়; এমন সুখ চায়, যার কখনও শেষ হবে না: এমন সুখ চায়, যার সহিত দুঃখের লেশমাত্র সম্মিশ্রণ নাই, যার চেয়ে শ্রেষ্ঠ সুখ আর নেই। এই রকম সুখের সন্ধানে জীব ঘুরে বেড়াচ্ছে। যতক্ষণ জীব এই অনন্ত সুখ না পায়, ততক্ষণ ওর ছটফটানি ঘোচে না। অনন্ত সুখই জীবের প্রকৃত লক্ষ্য। এই অনন্ত সুখকেই মুক্তি, মোক্ষ, পরম-পুরুষার্থ, নিঃশ্রেয়স ইত্যাদি বলা হয়। একে পেলেই—এই অনন্ত সুখের অধিকারী হলেই জীব কৃতকৃত্য হয়ে যায়, তখন আর কিছু ক'রবার বা পাবার বাকী থাকে না। ইহাই জীবের পরম গতি।

এই সঙ্ঘর্ষময় কোলাহলময় জীবনের পিছনে এক ঐশী সুখময় স্থিতি আছে; যেখানে পৌঁছালে সব সমস্যার আপনা-আপনি সমাধান হ'য়ে যায়, সমস্ত দুঃখের অত্যন্ত অভাব ঘটে, সমস্ত ক্লেশ কর্ম্ম, শোক সন্তাপ, চিন্তা ও ভয় বিলীন হ'য়ে যায়—আস্তিক-নাস্তিক সকল সম্প্রদায়ই এ কথা মানে। কিন্তু ঐ

সুখের স্বরূপ সম্বন্ধে অনেক মতভেদ দেখা যায়; কেউ কেউ স্বর্গ সুখকে চরম সুখ মনে করে। কিন্তু স্বর্গ সুখের নাশ আছে; বহু পুণ্যফলে, স্বর্গসুখ ঘটে; যতক্ষণ পুণ্যফল ভোগ হ'তে থাকে, ততক্ষণ স্বর্গসুখ বর্ত্তমান থাকে; যত ভোগ হ'তে থাকে, পুণ্য তত ক্ষয় হ'তে থাকে; পরে পুণ্য যখন একেবারে ক্ষয় হ'য়ে যায়, তখন স্বর্গ সুখেরও নাশ হয়। সুতরাং স্বর্গসুখ অবিনাশী নয়। শ্রুতি মুখে শুনিতে পাই—'অপাম সোমমমৃতা অভূম' (আমি বেদোক্ত সোমযজ্ঞ সম্পাদন করিয়াছি ও সোম পান করিয়া অমর হইয়াছি)। সোমযজ্ঞাদি করিয়া যে অমরত্ব লাভ করা যায়, সেটা আমাদের তুলনায় দীর্ঘকালস্থায়ী ব'লতে পারা যায়, সেটা আপেক্ষিক। দেবতাদিগের আয়ু আমাদের তুলনায় খুব বেশী হ'লেও একদিন না একদিন তারও শেষ হ'বে; যে পুণ্যফলে দেবতারূপে জন্ম-লাভ হয়েছিল, সেই পুণ্য ভোগ দ্বারা ক্ষয় হলে স্বর্গ হইতে বিচ্যুত হয়; হইয়া মর্ত্ত্যলোকে আবার জন্মগ্রহণ করতে বাধ্য হয়। "ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্ত্যলোকং বিশন্তি।' শ্রীগীতায় আরও বলা হইয়াছে—ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত সব লোকের পুনরাবর্ত্তন আছে অর্থাৎ যার উৎপত্তি আছে, তার বিনাশ আছে। দেবতা-দিগের মধ্যেও যার পুণ্য অধিক, তাঁর আয়ুও তুলনায় অধিক। অন্যান্য দেবতাদিগের অপেক্ষা দেবরাজ ইন্দ্রের আয়ু খুব বেশী এবং তাঁর ভোগও অন্যান্য দেবতার ভোগ অপেক্ষা অনেক গুণ বেশী। এই হেতু একজনের আয়ু ও ঐশ্বর্য্য ভোগ অপর অপেক্ষা বেশী হওয়ায় একজন অপরকে ঈর্ষ্যা করে, অভিমান দেখা দেয়, ঈর্ষ্যানলে পুড়ে মরতে থাকে। ঈর্ষ্যার সঙ্গে সঙ্গে অধিক সুখের কামনা, ভূমা সুখের লালসা জাগতে থাকে এবং যে সুখ তার ভোগ হচ্চে কখন তার শেষ হয় এই ভয়টাও তার থাকে। ইন্দ্রের ইন্দ্রত্ব ঘুচিবার ভয় আছে। পৃথিবীতে যদি কেউ উগ্র তপস্যা করতে আরম্ভ করে, অমনি ইন্দ্রের ভয় হয় পাছে সে ইন্দ্রত্ব কাড়িয়া লয়। অমনি তার উগ্র তপস্যায় বিঘ্ন উৎপাদনের জন্য স্বর্গ বেশ্যাদের তলব পড়ে, মেনকা, উর্ব্বশী প্রভৃতি স্বর্গলোকের রূপজীবীদের উপর আদেশ হয়—যেমন করে পার অমুক উগ্রতপাকে তপভ্রষ্ট কর।

তা হলে বিচারে দেখা গেল স্বর্গসুখ পার্থিব দৃষ্টিতে খুব বড় হ'লেও নিরবধি

এবং পূর্ণ নয়। নিরবধি ও পূর্ণ সুখ যে চায়, স্বর্গসুখ পেয়ে তার আশা মেটে না, তার অভীষ্ট পূর্ণ হয় না।

জীব প্রাপ্তসুখের অপেক্ষা বেশী সুখ পেতে অভিলাষ করে এবং যতটুকু দুঃখ নাশ হ'য়েছে তার চেয়ে বেশী দুঃখনাশ হ'ক, এইটাই সে ইচ্ছা করে। স্বাভাবিক নিয়মই হল এই। নিরতিশয় সুখ সুখের পরাকাষ্ঠা, সেই রকম নিরতিশয় দুঃখনিবৃত্তি দুঃখনিবৃত্তির পরাকাষ্ঠা। যার নিরতিশয় সুখপ্রাপ্তি হ'য়েছে এবং নিরতিশয় দুঃখনিবৃত্তি ঘটেছে, তার আর কোন কিছুই অভিলক্ষনীয় থাকে না। ইয়মেবাবস্থা সোঽশ্নুতে সর্ব্বান্ কামান্ (তৈত্তিঃ ২।১।১), অথ সোঽভয়ং গতো ভবতি (তৈত্তিঃ ২।৭।১), অমৃতত্বং চ গচ্ছতি (কঠঃ ৬।৮) ন স ভূয়োঽভিজায়তে (অঃ বিঃ ৩৮) এই সকল শ্রুতিবাক্য মোক্ষের অবস্থা প্রকাশ ক'রছে; এই অবস্থার নামই মোক্ষ। 'সর্ব্বান্ কামান্ অশ্নুতে' এই শ্রুতিবাক্যে নিরতিশয় সুখপ্রাপ্তি হয়েছে এইটাই আপাততঃ মনে হয়। 'অভয়ং গতো ভবতি, অমৃতত্বং চ গচ্ছতি, ন স ভূয়োঽভিজায়ত' এই সকল শ্রুতিবাক্যে নিরতিশয় দুঃখ নিবৃত্তির কথাই বলা হ'য়েছে। ভাবী দুঃখ অনুসন্ধান করতে গিয়ে চিত্তে যে উদ্‌বেগ উপস্থিত হয়, তাকেই 'ভয়' বলে। ভয় চিত্তের বৃত্তি বিশেষ। স্বল্প দুঃখের অস্তিত্বেও ভয় থাকে; সর্ব্বথা ভয়রহিত অবস্থানকেই নিরতিশয় দুঃখনিবৃত্তি বলে। 'অতএব অভয়ং গতো ভবতি' বলায় নিরতিশয় দুঃখনিবৃত্তির কথাই বলা হ'য়েছে। জন্ম-মরণ হওয়া রূপ দুঃখ' অন্যান্য সমস্ত ইতর দুঃখ অপেক্ষা বড়। মোক্ষাবস্থায় 'সোঽমৃতত্বায় কল্পতে ন স ভূয়োঽভিজায়ত' এই সকল শ্রুতি বাক্য দ্বারা জন্মমরণের অভাব সূচনা করিতেছে। সুতরাং মোক্ষাবস্থায় নিরতিশয় দুঃখনিবৃত্তি হয় ইহাই বুঝিতে হইবে।

বেদান্ত মুখে শুনি,—ব্রহ্মই নিরতিশয় পূর্ণ সুখস্বরূপ। ব্রহ্মের অভেদরূপ সাক্ষাৎকার হলে জীব সকল দুঃখ ও বন্ধন হতে মুক্তি পায় এবং পরম শান্তিভোগ করিতে থাকে; তার আর জন্ম-মৃত্যুর ভয় থাকে না; হর্ষ-বিকারাদি তার থাকে না—"হর্ষশোকৌ জহাতি।" চিরদিনের জন্য তার অজ্ঞান অন্ধকার দূর হ'য়ে যায়; অবিদ্যা-গ্রন্থি খুলে যায়; সকল সন্দেহ ঘুচে যায়; সকল প্রকার ক্লেশ-কর্ম্ম-নষ্ট হ'য়ে যায়; তার সংসারে কোন কর্ত্তব্য থাকে না।

ভেদরূপে পরমাত্মার সাক্ষাৎকার হ'বার পর মানুষ জন্মমরণ বন্ধন থেকে মুক্তি পায়, সকলপ্রকার ক্লেশ থেকে মুক্তি পায় ; পাইয়া সগুণ ভগবানের অপ্রাকৃত নিত্যধামে অপ্রাকৃত দেহ লইয়া বাস করে এবং ভগবানের সান্নিধ্য-সুখ অনুভব ক'রতে থাকে। ভগবান আমি ছাড়া অপর একজন এই ভেদোপাসনায় সিদ্ধি-লাভ করিলে চারপ্রকারের মুক্তির কোন একপ্রকার মুক্তিলাভ অবশ্যই ঘটে। মুক্তি চারপ্রকার যথা—সালোক্য (ভগবৎ লোকে বাস), সামীপ্য (ভগবানের সান্নিধ্যে বাস), সারূপ্য (ভগবানের সমানরূপ প্রাপ্তি) ও সাযুজ্য (ভগবানে বিলীন হইয়া স্থিতি)। ভেদোপাসানায় আত্ম-সাক্ষাৎকারের পর উপরোক্ত যে কোন একপ্রকারের মুক্তি লাভ হ'য়ে থাকে, জন্ম-মৃত্যু-চক্র হ'তে অব্যাহতি লাভ করে সদা নিরতিশয় আনন্দ অনুভব ক'রতে থাকে। ইহাই জীবের অন্তিম লক্ষ্য, ইহাই সাধকের প্রার্থনীয় বস্তু। এই অবস্থা পাবার জন্যই ভগবান আমাকে মনুষ্য যোনিতে পাঠিয়েছেন, মানুষের দেহ দিয়েছেন। কেন না, মানুষই সাধন ভজন দ্বারা ইহা লাভ করিতে পারে ; অন্য যোনিতে জন্মগ্রহণ ক'রলে তা হয় না। মনুষ্যযোনি কর্ম্মভূমি, তির্য্যক্ বা দেব যোনি ভোগ ভূমি। অন্য যোনিতে কেবলমাত্র ভোগ হয়, কর্ম্ম—সাধন-ভজন—একমাত্র মনুষ্য-যোনিতেই সম্ভব। যখন মানুষ হ'য়ে জন্মেছি, নরদেহ ধারণ করেছি, তখন সাধন ভজনের চেষ্টা ক'রতেই হবে, মুক্তি পাবার জন্য যত্ন ক'রতেই হ'বে, যাওয়া-আসা বন্ধ ক'রবার জন্য চেষ্টা ক'রতেই হ'বে। মুক্তি পাবার জন্য চেষ্টা করাই নরদেহ ধারণ করার সার্থকতা ; মুক্তি পাওয়াটাই মনুষ্য শরীরের চরিতার্থতা। অন্যথা ভোগ সুখ ত পশু পক্ষী আদি অন্য যোনিতে পেতে পারি। ভোগে যদি আমার তৃপ্তি হতো, ত কবে হ'তে পারত। আজ পর্য্যন্ত কত কত যোনিতে জন্মেছি ; ভিন্ন ভিন্ন যোনিতে ভিন্ন ভিন্ন ভোগ শেষ করেছি ; কৈ তৃপ্তি ত পাই নি।

নানাযোনিসহস্রাণি দৃষ্ট্বা চৈব ততো ময়া।
আহারাঃ বিবিধাঃ ভুক্ত্বা পীত্বা চ বিবিধাঃ স্তনাঃ।—উপনিষদ্

অসংখ্য যোনি ভ্রমণ করেছি, অসংখ্য ভোগ্য ভোগ করেছি ; কৈ, তৃপ্তি ত পাইনি। এ থেকে সিদ্ধান্ত এই, যে ভোগে সুখ নাই, ভোগত্যাগে সুখ। অতএব এখন আমাকে ভোগের আসক্তি ছাড়্তে হ'বে, নিষ্কাম কর্ম্ম করে যেতে

হ'বে, ভক্তি বা জ্ঞানমার্গ অবলম্বনে মুক্তি পাবার জন্য পুরদমে চেষ্টা করে যেতে হ'বে ; আর এই জন্মেই যাতে মুক্তি পেতে পারি তাই করতে হ'বে। কেন না, কে জানে এর পর আর এমন দুর্লভ অবসর পাব কি না ? শাস্ত্র মানুষ-জন্মকে দেবদুর্লভ বলে আদর করেছেন। যখন নানাপ্রকার যোনি ভ্রমণ করতে করতে জীব একেবারে ক্লান্ত শ্রান্ত অবসাদ গ্রস্ত হয়ে পড়ে, তখন ভগবান তার উপর দয়া করে তাকে মনুষ্য শরীর দান করেন। আর এই নরদেহ দানের মানে হচ্চে জীবকে সুন্দর দেবদুর্লভ অবসর দেওয়া। এই সুন্দর অবসরে জীব জন্ম-মৃত্যু হইতে অব্যাহতি লাভের চেষ্টা করতে পারে। এই অবসরের সদ্ ব্যবহার যদি জীব না করে, তা হলে তাকে পরে পস্তাতে হয় ; অনুতাপ করতে হয় ; পরে পস্তে আর লাভ কি ?

এই মুক্তি সম্বন্ধে সাধকের মনে একপ্রকার আশঙ্কা দেখা দেয়, এক সন্দেহ উপস্থিত হয়। সাধক মনে করে, মুক্তি পেলে মহাপ্রলয় পর্য্যন্ত আর তাকে সংসারে জন্ম-মৃত্যুর মধ্যে আসতে হ'বে না। কিন্তু তারপর আবার কল্পারম্ভে আসতে হ'বে। একেবারে পুনরাবর্ত্তন হ'বে না—এটা সে মানতে চায় না ; কেন না, যদি মুক্ত পুরুষ আর সংসারে কখনও ফিরে না আসেন, তবে যখন একে একে সব জীব মুক্তি পেয়ে যা'বে, তখন আর সংসার থাকবার কথা নয়। অনাদিকাল থেকে সংসার চলছে, কৈ, আজ পর্য্যন্ত ত সংসারে সকল জীব মুক্তি পেল না ? সংসার বরাবর একরকমই চলছে। সুতরাং মুক্ত জীব মহাপ্রলয় পর্য্যন্ত সংসারে না আসতে পারে, জন্ম-মরণের হাত থেকে মুক্তি পেতে পারে, কিন্তু তারপর কল্পারম্ভে আবার মুক্তপুরুষকে সংসারে নিশ্চয়ই আসতে হয়, সংসার তা নইলে বজায় থাকে না। মুক্ত জীব যে সংসারে আর কখনও ফিরবে না—এটা বিচারসহ কি না ?

সন্দেহ পক্ষের তাৎপর্য্য এই যে,—মানুষের চেয়ে দেবতাদের আয়ু যেমন খুব বেশী, কিন্তু দেবতাদের আয়ুও এক দিন শেষ হয়ে যায় ; তেমনি মুক্ত পুরুষদের আয়ু দেবতাদের আয়ুর তুলনায় খুব বেশী, কিন্তু সে আয়ুরও একদিন শেষ আছে। তা'হলে মুক্ত পুরুষের আয়ুও আপেক্ষিক।

এই সন্দেহ শ্রুতিবিরুদ্ধ। ছান্দোগ্য উপনিষৎ বলিতেছেন,—

ন চপুনরাবর্ত্ততে ন চ পুনরাবর্ত্ততে।

শ্রীভগবান শ্রীগীতাতেও বলেছেন,—

"মামুপেত্য তু কৌন্তেয় পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে।"

"গচ্ছন্ত্য-পুনরাবৃত্তিং জ্ঞাননির্ধূত কল্মষাঃ।"

যদি যুক্তি দ্বারাই এই প্রশ্নের মীমাংসা করতে হয়, তা হলে যুক্তি আমার পক্ষই সমর্থন করবে। ধরে নেওয়া যাক্ যে, মুক্ত পুরুষ কখনো সংসারে ফেরে না, মুক্ত পুরুষের কখনো পুনরাবর্ত্তন হয় না। আমার যদি এই বিশ্বাস থাকে, তবে আমি মুক্তির জন্য খুব জোর চেষ্টা করবো, যাতে এই জন্মেই মুক্তি পাই। যদি এ জন্মে না হয়ে উঠে, তবে পরের জন্মে নিশ্চয়ই মুক্তি পাব। সুতরাং মুক্ত জীব ফিরে আসে না—এটা মেনে নেওয়া সাধকের পক্ষে লাভদায়ক যুক্তিযুক্ত, সর্ব্বোত্তম এবং সুরক্ষিত। মুক্ত জীব কখনো ফিরে আসে না, জন্ম মরণের হাত হ'তে চিরকালের জন্য অব্যাহতি পায়, অক্ষয় সুখের ভাগী হয়,—এই আশা ও বিশ্বাস আমাকে মুক্তি পাবার জন্য তীব্র চেষ্টা ও প্রয়াস এনে দেবে, আমি প্রাণপণে চেষ্টা করবো যাতে এই জন্মেই মুক্তি এসে যায়। যদি এসে গেল ত ভালই, মুক্তি পেয়ে গেলাম, যদি এ জন্মে না আসে, পরজন্মে নিশ্চয় পা'ব। কেন না, কর্ম্মত বৃথা যায় না ; চেষ্টার ফল আছেই। কিন্তু যদি আমি ধরে না নেই—না মানি যে, মুক্ত জীব কখনো ফিরে না ; তা হলে আমার সমূহ ক্ষতি। আমার বিশ্বাস দৃঢ় না থাকায় মুক্তির জন্য প্রাণপণে চেষ্টা আসবে না ; মুক্ত পুরুষের পুনরাগমন যে মানবে, সে অপুনরাগমনরূপ পরমগতিকে কখনো পাবে না ; কেন না আত্যন্তিক স্থিতিতে তার বিশ্বাস নাই ; বিশ্বাস না থাকলে প্রথমতঃ আমার সেদিকে চেষ্টাই আসবে না, আর যদি চেষ্টা আসে ত, গদাইলস্করি চালে সে চেষ্টা চলতে থাকে, জোর চেষ্টা আসে না ; জোর চেষ্টা না হ'লে সফলতাও দেখা দেয় না।

তারপর দ্বিতীয় আশঙ্কা হচ্ছে যে, যদি মুক্ত জীব সংসারে ফিরে না আসে, তবে ক্রমে ক্রমে সমস্ত জীব একদিন মুক্তি পেয়ে যা'বে ; তখন সংসারের অভাব হ'য়ে প'ড়বে,—দুনিয়ায় কোন জীব থাকবে না। এ আশঙ্কা বিচার-বিরুদ্ধ

সুতরাং সমীচীন নহে। কেন না, সংসারে যত প্রাণী আছে, তাদের তুলনায় মুক্তি ইচ্ছু জীবের সংখ্যা খুবই কম ; সমুদ্রে শিশিরবিন্দুবৎ। মুক্তির অধিকার কেবলমাত্র মানুষের আছে, অন্য জীবের নাই। তারপর মানুষের মধ্যে হাজারের মধ্যে একজন মুক্তি পাবার চেষ্টা করে ; এরূপ যত্নশীলদের মধ্যে একজন সফলপ্রযত্ন হয়। তা'হলে মুক্ত জীবের সংখ্যা কত কম ভেবে দেখ। মনে কর সমুদ্রের ধারে একটি পাখী বাস করে এবং জগত সংসারে আর কোন জীব জন্তু নাই। ঐ পাখীটি সমুদ্র হ'তে রোজ আবশ্যক মত একটু একটু জল খায়। পাখীটি রোজ একটু একটু জল খায়, সমুদ্রের জল কমে যাচ্ছে তা' হ'লে এমন একদিন আস্‌বে যে দিন সমুদ্রে আর জল থাক্‌বে না ; এ যুক্তি ও যেমন তোমার আশঙ্কাও তেমনি ; মুক্ত জীব সংসারে ফিরে আসে না ; আজ 'এ' মুক্ত হল, কাল 'ও' মুক্ত হল ; ক্রমে ক্রমে সব জীব মুক্ত হয়ে যাবে ; তখন আর সংসারে জীব দেখ্‌তে পাওয়া যাবে না—এ আশঙ্কা বালোচিত ; ব্যবহারিক যুক্তিবিরুদ্ধ বলিলেও চলে।

তারপর প্রশ্ন হচ্চে দেহ থাক্‌তে জীব মুক্ত হয় কি না ? কেহ কেহ বলেন জীবন থাক্‌তে মুক্তি হয় না। জীবন ও মুক্তি একসঙ্গে কি ক'রে হ'তে পারে ? এ যে সোণার পাথরবাটি গোছের। এ আশঙ্কা শ্রুতি-বিরুদ্ধ, স্মৃতি-বিরুদ্ধ। শ্রুতি বলেন 'অত্র ব্রহ্ম সমশ্নুতে'—এই জন্মেই ব্রহ্মপ্রাপ্তি ঘটে।

'ইহৈব তৈর্জ্জিতঃ সর্গঃ' (শ্রীগীতা)—এই জীবনেই তাঁরা জন্মমরণরূপ সংসার জয় করিয়া ফেলেন। ইতিহাস পুরাণে জীবন্মুক্ত পুরুষের অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। স্থূল, সূক্ষ্ম কারণ— তিনি আবরণ থেকে জীবন্মুক্ত পুরুষ মুক্ত থাকেন ; অনুকূল প্রতিকূল ঘটনার ভিতর পড়লেও হর্ষ-শোকাদি বিকার তাঁহাদের মধ্যে দেখ্‌তে পাওয়া যায় না।

ন তস্য পুণ্যং ন হি তস্য পাপং
নিষেধনং নৈব পুনর্ন বৈধং
সদা মগ্নঃ সুখ-বারিরাশৌ
বপুশ্চরেৎ প্রাক্ কৃত-কর্ম্মযোগাৎ।

কেউ কেউ বলেন, মুক্ত পুরুষের অন্তঃকরণে কাম ক্রোধ লোভ আদি

বিকার থাকৃতে পারে এবং তাঁরা মিথ্যা, কপটতা, চুরি, ব্যভিচার এবং মদ্য পানাদি নিষিদ্ধ আচরণ করিতে পারেন। কিন্তু এটা ঠিক নহে। অবশ্য জ্ঞানীরা বিধি-নিষেধের উপরে উঠে যান ; তাঁদের কর্ত্তব্য বলে জগতে কিছু নেই ; নিষিদ্ধ কর্ম্ম তাঁরা কেন কর্‌তে যাবেন ? তার ত কোন হেতু নাই। শাস্ত্র এবং যুক্তি উভয় দিক দিয়ে বিচার করে দেখ্‌লে দেখা যায় যে, জ্ঞানীদিগের অন্তঃকরণে কাম-ক্রোধাদি বিকার কখনো থাকৃতে পারে না ; কেন না কামনা হতেই নিষিদ্ধ কর্ম্ম ঘটা সম্ভব ; কামনার মূল হচ্চে আসক্তি ; আসক্তির কারণ অজ্ঞান। যে জ্ঞানী, সে অজ্ঞানকে আশ্রয় কর্‌বে কেন ? জ্ঞানমার্গে যেতে হ'লেই কাম-ক্রোধাদি ত্যাগ কর্‌তে হয়। কাম-ক্রোধাদি ত্যাগ না কর্‌লে ত তাকে জ্ঞানীই বলে না। শ্রীগীতায় তাই শ্রীভগবান বলেছেন,—

> ত্রিবিধং নরকস্যেদং দ্বারং নাশনমাত্মনঃ
> কামঃ ক্রোধস্তথা লোভস্তস্মাদেত ত্রয়ং ত্যজেৎ।
> এতৈর্বিমুক্তঃ কৌন্তেয় তমোদ্বারৈস্ত্রিভির্নরঃ
> আচরত্যাত্মনঃ শ্রেয়স্ততো যাতি পরাং গতিম্।

কাম, ক্রোধ, লোভ—এই তিনটি নরকে যাবার রাস্তা, নরকে প্রবেশ কর্‌বার দরজা, নিজকে নাশ কর্‌বার উৎকৃষ্ট উপায়—ইহারা অধোগতি ঘটায়। এই তিনটিকে ত্যাগ করাই চাই। সাধকের সাধনাই হচ্চে তাই। কাম, ক্রোধ, লোভ ত্যাগ হ'লে তখন সাধক আপন কল্যাণ আচরণ কর্‌তে পারে এবং পরমগতি—মুক্তিলাভ কর্‌তে পারে। অন্যত্র জ্ঞানীপুরুষ সম্বন্ধে 'কাম ক্রোধ-বিযুক্তানাম্' এই বিশেষণের প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়। জ্ঞানী পুরুষের ক্রোধ থাকে না—একেবারে নষ্ট হ'য়ে যায় ; কাম হ'তেই ক্রোধের জন্ম ; সুতরাং কাম ক্রোধ উভয়ই জ্ঞানী পুরুষের নষ্ট হইয়াছে বুঝিতে হইবে।

'রসোঽপ্যস্য পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ত্ততে' —শ্রীগীতা

কাম ক্রোধ লোভ থাকৃলেই নিষিদ্ধ কর্ম্ম লোকে করে ; জ্ঞানী লোকের কাম ক্রোধ লোভ নাই ; সুতরাং তাঁরা কখনো নিষিদ্ধ কর্ম্ম কর্‌তে পারেন না। অতএব কোন পাপকাজ জ্ঞানীরা করেন না।

কেউ কেউ বলেন, বর্ত্তমান কাল মুক্তির অনুকূল নহে, কলিযুগে জীবের মুক্তিলাভের শক্তি নাই। আবার কেউ বলেন, মুক্তির অধিকার কেবল

গৃহত্যাগী সন্ন্যাসীদিগের, আশ্রমবাসীর নাই। এ সকল সিদ্ধান্তও যুক্তিযুক্ত নহে।

শাস্ত্রে কলিযুগের অনেক মহিমা কীর্ত্তন শুনা যায়:—

স্বল্পেনৈব প্রযত্নেন ধর্ম্ম সিদ্ধ্যতি বৈ কলৌ।
নরৈরাত্মগুণাম্ভোভিঃ ক্ষালিতাখিল-কিল্বিষৈঃ। —বিষ্ণুপুরাণ।

কলিযুগে মানুষ সদ্বৃত্তি অবলম্বন করে অতি অল্প প্রয়াসে সমস্ত পাপ হইতে পরিত্রাণ পায় ও ধর্ম্ম কর্ম্মে সিদ্ধিলাভ করে, অন্য যুগে যে কাজ ধ্যান যজ্ঞ ও পূজার্চ্চনা দ্বারা সম্পন্ন হয়, কলিযুগে সেই কাজ ভগবানের নাম সাধন দ্বারা সাধিত হয়।

কৃতে যদ্ ধ্যায়তো বিষ্ণুং ত্রেতায়াং যজতো মখৈঃ।
দ্বাপরে পরিচর্য্যায়াং কলৌ তদ্ধরি-কীর্ত্তনাৎ॥

এ সত্ত্বেও যদি বল কলিযুগে মুক্তি হয় না, তা হ'লে শাস্ত্রের অপমান করা হয় আর নিজের জন্য মুক্তির দরজা বন্ধ করা হয়। কেন না, যারা বলে যে, কলিযুগে মুক্তি হয় না, তারা মুক্তির জন্য প্রয়াসও করে না; আর যদি শাস্ত্র বচন সত্য হয়, ও মুক্তি এ যুগে সম্ভব হয়, তা হ'লে তারা মুক্তি থেকে বঞ্চিত রহে গেল। আর যার বিশ্বাস আছে যে, কলিযুগে মুক্তি হ'তে পারে, সে প্রাণপণে চেষ্টা ক'রবে, এবং সেই চেষ্টা যদি ঠিক পথে হয়, তবে সে মুক্তিলাভ ক'রবে। যদি মানা যায় যে মুক্তি হয় না, তবু তার ক্ষতি নাই, সে শান্তিতে জীবন কাটিয়ে দেবে, দুর্গুণ ও দুরাচার থেকে রক্ষা পাবে; ফলে নূতন পাপ আর হ'লো না, ভবিষ্যৎ সুখময় হ'বে, সংসারে উহার প্রতিষ্ঠা লাভ হ'বে, ধর্ম্মের মর্য্যাদা স্থাপিত হবে, তার দ্বারা অনেক লোক-কল্যাণ সাধিত হ'বে। সব দিক দিয়ে তার লাভই হ'লো, লোক্সান হ'ল না। অতএব শাস্ত্র ও যুক্তি উভয় তরফ থেকে মানতেই হয় যে, কলিযুগেও মুক্তি হওয়া সম্ভব। এটা যেই মেনে নিলে, অমনি সাধনায় প্রাণপণে লেগে যাওয়া চাই। মুক্তির জন্য চাই জ্ঞান ও ভক্তি—এই দুটী মুখ্য সাধন; দেশ কাল এ সাধনে বাধা দিতে পারে না। বর্ত্তমান কালেও অনেক জ্ঞানী মহাত্মা ও উচ্চ অঙ্গের ভক্ত সংসারে দেখতে পাওয়া যায়।

এখন কথা হচ্ছে, গৃহী মুক্তি পেতে পারে কি না? এ বিষয়ে সনাতন

বৈদিক সিদ্ধান্ত অত্যন্ত ব্যাপক ও উদার। সেই সিদ্ধান্ত অনুসারে মুক্তি বা ভগবৎ প্রাপ্তির অধিকার মনুষ্য মাত্রেরই আছে। কোন নির্দ্দিষ্ট বর্ণ, কি কোন নির্দ্দিষ্ট আশ্রম, কি কোন নির্দ্দিষ্ট জাতি বা কোন নির্দ্দিষ্ট সম্প্রদায় মোক্ষের অধিকারী, এ কথা ঠিক নহে। জ্ঞান ও ভক্তি মুক্তির প্রধান সাধন। জ্ঞান ও ভক্তির অভ্যাস সকল বর্ণের লোক, সকল আশ্রম, সকল জাতি এবং সকল সম্প্রদায়ের লোক করিতে পারে। জীব মাত্রেই ভগবানেরই সন্তান; তাঁহার সনাতন অংশ; সুতরাং ভগবানকে পাবার অধিকার সকলেরই আছে। মনুষ্যেতর জীবের বুদ্ধি ও বিবেক নাই। সাধনের যোগ্যতা নাই। সেই জন্য তারা পরম লাভ থেকে বঞ্চিত থেকে যায়। ভগবানের দরবারে যাবার কোন বাধা বিঘ্ন নাই। প্রত্যেক জীবের জন্য তার দরজা খোলা। তাঁর বরদ হস্ত সকলের শিরে সমান আশীর্ব্বাদ বর্ষণ করিতেছে। সকল জীব তাঁর কৃপা পাবার অধিকারী।

মনুষ্যের মধ্যে স্ত্রী, বৈশ্য, শূদ্র তথা চণ্ডালাদি পাপ যোনিও পরম গতির অধিকারী (শ্রীগীতা) ভক্ত শিরোমণি গোপিনীগণ, নন্দাদি বৈশ্যগণ, সঞ্জয়াদি শূদ্র-গণ, পাপ-যোনিজাত গুহকাদি নিষাদগণ ভক্তিতে মুক্তি পাইয়াছিলেন। তাহারা ইতিহাস-প্রসিদ্ধ উদাহরণ। অবশ্য গৃহী অপেক্ষা সন্ন্যাসীদের পক্ষে বা শূদ্র অপেক্ষা ব্রাহ্মণের পক্ষে মুক্তি লাভ সহজ সাধ্য ও সুকর। কিন্তু তাই বলে গৃহস্থেরা মুক্তি পেতে পারে না; বা শূদ্রেরা মুক্তি লাভ করতে পারে না এ কথা বলা চলে না; ব'ললে ভুল বলা হবে। জনকাদি ব্রাহ্মণেতর ও গৃহস্থ হইয়াও জীবন্মুক্ত হইয়াছিলেন। তিনি কর্ম্ম দ্বারাই পরম সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। যে যার বর্ণ গত কাজ উপযুক্ত ভাবে করে যেতে থাকলে মুক্তির পথে কোন বাধা পায় না (শ্রীগীতা)। কর্ম্ম ত্যাগ ক'রলেই সন্ন্যাসী হওয়া যায় না; গেরুয়া প'রলেই সন্ন্যাসী হয় না; কর্ম্ম ফল ত্যাগ করা চাই; কর্ম্মফলের আশা ত্যাগ করে আপন আপন বর্ণাশ্রমোচিত কর্ত্তব্য পালন যিনি করেন. তিনিই সন্ন্যাসী, তিনিই প্রকৃত যোগী (শ্রীগীতা)। তবেই দেখ, গৃহস্থ মুক্তির অধিকারী—ইহা শাস্ত্র সম্মত।

এখন যুক্তির কথা ধর; যদি বলি, ব্রাহ্মণেতর বংশে জন্মেছি, আমার মুক্তি হবে না; তা হ'লে আমার মুক্তির জন্য প্রাণপণে চেষ্টা আসবে না, যত্ন হবে

না; সাধন ভজনে গা লাগবে না; ফলে আমার খুব ক্ষতি হল। কিন্তু যদি মুক্তি হবে জেনে সাধন ভজনে উঠে পড়ে লেগে যাই, তা' হলে আমি উত্তম হতে উত্তমতর অবস্থায় উঠে যেতে পারি, উচ্চতর স্তরে চলে যাব; সময়টা উত্তম কাজেই ব্যয় হবে; ক্ষতি ত কিছু হ'ল না। বরং লাভ ষোল আনা। অপর পক্ষে—আমি গৃহী; মুক্তি হবে না—এ জ্ঞান থাকলে এ জন্মে ত আমার মুক্তি হবেই না; আগামী জন্মেও মুক্তির কোন ভরসা করা যায় না; আস্‌ছে জন্মে সাপ হব কি ব্যাঙ হব তার কিছুই স্থির নাই।

শ্রুতি বলেন—"ইহ চেদবেদীদথ সত্যমস্তি ন চেদিহাবেদীন্মহতী বিনষ্টিঃ"। —অর্থাৎ এই জন্মেই যদি পরমাত্মার জ্ঞান হয়ে গেল ত ভাল, নইলে ভয়ানক ক্ষতি, ভারী লোকসান। এখন আমি যে বর্ণে জন্মেছি, যে আশ্রমে আছি, সেই বর্ণ-আশ্রম ও আমার বর্ত্তমান অবস্থায়ই আমি ভগবানকে নিশ্চয়ই পেতে পারি, এইরূপ দৃঢ় নিশ্চয় করে মুক্তি সাধনে লেগে পড়া চাই। সত্য সঙ্কল্পে মনের তেজ খুব বাড়ে। মনের বল ও অধ্যবসায় যদি দৃঢ় থাকে, তার উপর ভগবান যদি কৃপা করেন, তা হ'লে সাধনায় আমি নিশ্চয় সফলতা লাভ ক'রব; এবং এই জন্মেই এই জীবনেই চরম লক্ষ্যে পৌঁছে যাব; পরমাত্মায় জীবাত্মা মিশে যাবে; দ্বৈত ভাব ঘুচে যাবে, খণ্ড অখণ্ডে মিশে যাবে; নদী সাগরের বুকে আত্মহারা হবে; জীব শিব হয়ে যাবে; পরম পদে চির বিশ্রান্তি লাভ ঘটবে। ওঁ শম্।

LIBRARY
No.........
Shri Shri Ma A... ...ee Ashram
BANARAS

পুনর্জন্ম মানিব কেন ? *

পুনর্জন্ম ও পরলোকের সিদ্ধান্ত হিন্দুধর্ম্মের খাস সম্পত্তি। জৈন ও বৌদ্ধমত হিন্দুধর্ম্মের শাখা বিশেষ এবং উহারাও পুনর্জন্ম ও পরলোক বিশ্বাসী। মুসলমানেরা ও খৃষ্টানেরা এ সিদ্ধান্ত মানে না। বর্ত্তমানে ইউরোপ ও আমেরিকার অনেক খৃষ্টান পুনর্জন্ম ও পরলোকে বিশ্বাসী হইয়াছে ও হইতেছে। ভারত-সন্তান পরলোকে দৃঢ় বিশ্বাসী। শুধু তাই নয়, আমাদের জীবনের প্রত্যেক অঙ্গের সহিত ইহার ঘনীভুত সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছে; ভারতে এমন কোন ধার্ম্মিক নাই, যে পরলোক বিশ্বাস করেন না। হিন্দুদিগের মধ্যে এমন কোন ধর্ম্মগ্রন্থ নাই, যেটি প্রত্যক্ষ বা অপ্রত্যক্ষভাবে পরলোক ও পুনর্জন্ম সমর্থন না করে। আমাদের মধ্যে পরলোক বিশাস এত মজ্জাগত ভাবে ঢুকেছে যে, সাধারণ বালক বালিকারা পর্য্যন্ত পুনর্জন্মে দৃঢ় বিশ্বাসী।

আত্মার উন্নতির জন্য পরলোক ও পুনর্জন্ম মানা আবশ্যক; ধর্ম্মভাব জাগাবার জন্য পরলোক মানা দরকার; সুখ-শান্তির জন্য পরলোক মানা দরকার, প্রেমের বিস্তারের জন্য, পাপ-তাপ হ'তে রক্ষা পাবার জন্য পুনর্জন্ম ও পরলোক মানা প্রয়োজন। আজ কাল সংসারে আত্মহত্যার সংখ্যা ক্রমেই বেড়ে চ'লেছে। বিশেষতঃ পাশ্চত্য দেশে আত্মহত্যার প্রসার খুব হচ্ছে। জীবনে নিরাশ হ'য়ে অথবা অসফলতায় দুঃখমগ্ন হ'য়ে, অপমান বা অপকীর্ত্তি থেকে রক্ষা পাবার জন্য, অথবা ইচ্ছা পূর্ণ হ'ল না বলে দুঃখ-সাগরে ডুব দিয়ে—আত্মহত্যা ক'রছে, গলায় ফাঁস লাগাচ্ছে, জলে ডুবে ম'রছে, বিষ খাচ্ছে, রেলে গলা দিচ্ছে, বা বন্দুকের গুলিতে প্রাণত্যাগ ক'রছে। এর একমাত্র কারণ আত্মার অমরতায় অবিশ্বাস—পরলোকে অবিশ্বাস। যদি আমার এই নিশ্চয় জ্ঞান জন্মায় যে, আমার জীবন এই শরীরে সীমাবদ্ধ নয়, শরীর গ্রহণের পূর্ব্বেও আমি ছিলাম, শরীর পতনের পরেও আমি থাকব; এই শরীরের শেষ করে দিলে, কষ্টের শেষ হবে না; পরন্তু যে সকল ভোগ করবার জন্য দেহ ধারণ করেছি, সেই সকল ভোগ শেষ হবার পূর্ব্বেই যদি দেহের নাশ করি, তা হ'লে

---

* ব

[আত্মহত্যা রূপ নূতন পাপের দরুণ আমার ভবিষ্য জীবন আরও কষ্টময় ও] দুঃখময় হবে ; এই বিশ্বাস দৃঢ় থাকলে আমার আত্মহত্যায় প্রবৃত্তি জাগ্‌বে না, আত্মহত্যা ক'রবার সাহসই হবে না। পাশ্চাত্য জড়বাদী সভ্যতার সংস্পর্শে এসে আমাদের আধুনিক শিক্ষাপ্রাপ্ত নব যুবকেরা, তরুণ-তরুণীরা আত্মহত্যাকে পাপ বলে মনে করে না, এ বড়ই দুঃখের বিষয়। আমাদের শাস্ত্র আত্মহত্যাকে মহাপাপ বলেছে ; এবং ইহার ফল শূকর কুকুর আদি অন্ধকারময় যোনি-প্রাপ্তি। শ্রুতিও বলেছেন,—

অসূর্য্যা নাম তে লোকা অন্ধেন তমসাবৃতাঃ।
তাং স্তে প্রেত্যাভিগচ্ছন্তি যে কে চাত্মহনো জনাঃ ॥—ঈশোপনিষদি।

অর্থাৎ এই জড়বাদী অসুর প্রবৃত্তি বিষয়মুগ্ধ লোক আত্মাকে অদর্শনরূপ অজ্ঞানে আচ্ছাদিত। যে কেহ আত্মাকে হত্যা করে, সে মরণের পর কুকর শিয়াল, শকুন আদি অজ্ঞানাচ্ছন্ন জীব-যোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়া অশেষ দুঃখ ভোগ করে।

সংসারে যে পাপের বৃদ্ধি দেখা যায়, মিথ্যা, কপটতা, চুরি, হিংসা, ব্যভিচার ও অনাচারের বৃদ্ধি দেখা যায় ; ব্যক্তির মত রাষ্ট্রগুলির মধ্যেও পরস্পর দ্বেষ ও কলহের বৃদ্ধি দেখা যায় ; বলবান দুর্ব্বলকে চেপে রাখ্‌তে চায় ; লোকে নীতি ও ধর্ম্মের পথ ছেড়ে অনীতি ও অধর্ম্মের পথ অবলম্বন ক'রছে, লৌকিক উন্নতি ও ভৌতিক সুখ ধ্যেয় বস্তু বলে মনে ক'রছে, এবং লৌকিক উন্নতি ও ভৌতিক সুখ প্রাপ্তির জন্য সদা যত্নবান, বিলাসিতা ও ইন্দ্রিয়-লোলুপতা বেড়েই চ'লেছে ; ভক্ষ্যাভক্ষ্যের বিচার উঠে যাচ্ছে ; জিভের স্বাদ আর শরীরের আরামের জন্য অপরের কষ্ট গ্রাহ্যের মধ্যেই আনে না ; আমার খেতে ভাল লাগে, সুতরাং খেতেই হবে ; পাখীকে গুড়ুম ক'রে গুলি মেরে তার মাংস খেতেই হবে, তাতেই জিহ্বার সুখ, তাতেই আমার আরাম ; গুলি খেয়ে পাখীটা যন্ত্রণায় ছট্‌ পট্‌ ক'রবে, মর্ম্মছেঁড়া যাতনা ভোগ ক'রতে ক'রতে যে তার প্রাণ বেরুবে, তা ভাববার দরকার নেই। আমার জিহ্বার স্বাদ মিটলেই হ'ল, শরীরের আরাম হ'লেই হ'ল। মাদকদ্রব্যের প্রচার বেড়ে চ'লেছে ; বেইমান ও ঘুষখোর না হ'লে কি উন্নতি হয় ? এই তাদের বুলি ; এক জন অপরকে প্রাণভয়ে ভালবাসতে চায় না—বিশ্বাস ক্রমশঃই কম হ'য়ে আস্‌ছে ; দমবাজি বেড়ে যাচ্চে ; অপরাধের সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে, দাম্ভিক ও পাষণ্ডের

বৃদ্ধি চারিদিকে—এ সবের একমাত্র কারণ লোকে বর্ত্তমান জীবনকে সার ধ'রে নিয়েছে, এর পর যে তার আর কোন জীবন থাকতে পারে, সে বিশ্বাস নেই। সেই জন্য সে বর্ত্তমান জীবনকে সুখী করবার জন্য যথাসাধ্য যত্ন চেষ্টা ক'রে থাকে।

যাবজ্জীবেদ্ সুখং জীবেদ্ ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ।
ভস্মীভূতস্য দেহস্য পুনরাগমনং কুতঃ॥ —চার্ব্বাক।

"যব্ তক্ জিয়ো, সুখসে জিয়ো ; কর্জা লেকর ভী আচ্ছে আচ্ছে পদার্থকোঁ উপভোগ করো। মরণেকে বাদ ক্যা হোগা, কিস্‌নে দেখ রক্‌খা হৈ।"—এই সর্ব্বনাশকারী বুলি আজ প্রত্যেকের মুখে, প্রতি ঘরে ঘরে। আর সেই জন্য সুখের বদলে দুঃখের গভীর স্তরে ক্রমেই মানুষ ডুবে যাচ্ছে। এ সব পরলোক আর পরজন্ম না মানবার অবশ্যম্ভাবী ফল।

পরলোক ও পুনর্জন্মের সিদ্ধান্ত আমাদের সকল শাস্ত্রই প্রত্যক্ষ বা অপ্রত্যক্ষ ভাবে সমর্থন ক'রেছে। বেদ হইতে আধুনিক দর্শন গ্রন্থ সকলেই সমস্বরে এই সিদ্ধান্তের পুষ্টিসাধন ক'রেছে। স্মৃতি, পুরাণ ও মহাভারত আদি গ্রন্থে পরলোক সম্বন্ধে এত প্রমাণ আছে যে, সেগুলি সংগ্রহ ক'রলে একটা মস্ত বড় বই হ'তে পারে। অত অবকাশও নাই ও তার আবশ্যকতা নেই। উপনিষদ্, গীতা, মনু-স্মৃতি, যোগসূত্র আদি হইতে কিছু কিছু প্রমাণ দেখাইয়া ও সদ্‌যুক্তি দ্বারা ঐ সিদ্ধান্তের পুষ্টি সাধনেরই যত্ন করিব।

কঠোপনিষদের নচিকেতার উপাখ্যান ইহার জলজ্যান্ত প্রমাণ। উপনিষদের প্রথম শ্লোকই পরলোকের সূচনা করে ; নচিকেতা যখন দেখিল যে উহার পিতা বাজশ্রবস ঋত্বিক ব্রাহ্মণগণকে বুড়ী গাইগুলি (যার আর দুধ দেওয়া সম্ভব নয়) দান করিতেছেন, তখন সে আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিল না। তখন সে চিন্তা করিতে লাগিল যে এরূপ নিষ্কর্ম্মা গরু দানে দাতাকে আনন্দ-হীন ধামে যাইতে হয়।

পীতোদকা জগ্ধতৃণা দুগ্ধদোহা নিরিন্দ্রিয়াঃ।
অনন্দা নাম তে লোকাস্তান্ স গচ্ছতি তা দদৎ॥

যে জল বা খাবার খেয়ে নিয়েছে, ঘাস খাওয়া শেষ ক'রেছে (অন্তিম কাল উপস্থিত হ'য়েছে), যার বাচ্চা বিয়োবার আর শক্তি নাই, কাজেই আর দুধ

দেবে না, এ রকম গরু দানে দাতাকে আনন্দ শূন্য লোকে যেতে হয়।

সেই জন্য নচিকেতা তার পিতাকে এ কার্য্য থেকে নিবৃত্তি করিবার চেষ্টা ক'রেও সফল প্রযত্ন হয় নাই। এর পর যখন তার পিতা ক্রোধের বশবর্ত্তী হ'য়ে তাকে মৃত্যুর হাতে সঁপে দিবার কথা বলিল, তখন সে পিতার আজ্ঞা শিরোধার্য্য ক'রে যমালয়ে যাত্রা করিল। তার পর নচিকেতা ও যমরাজের মধ্যে যে কথাবার্ত্তা হ'ল, তা বড় মহত্বপূর্ণ। যমরাজ নচিকেতাকে তিনটি বর দিতে চাহিলেন। যখন তৃতীয় বর প্রার্থনা করিতেছেন তখন নচিকেতা যমরাজকে এই প্রশ্ন করিলেন,—

যেয়ং প্রেতে বিচিকিৎসা মনুষ্যেঽস্তীত্যেকে নায়মস্তীতি চৈকে এতদ্ বিদ্যামনুশিষ্টস্ত্বয়াহং বরাণামেষ বরস্তৃতীয়ঃ।

মানুষ সম্বন্ধে আমার মনে একটা আশঙ্কা, একটা সন্দেহ জেগেছে; কেউ কেউ বলে, মরণের পর আত্মা থাকে, আবার কেউ কেউ বলে, আত্মা থাকে না; এ সম্বন্ধে আপনার নিকট আমি উপদেশ চাহিতেছি, যাতে ক'রে আমার আত্মজ্ঞান হ'তে পারে।—এই আমার তৃতীয় বর।

যমরাজ এ বিষয়টা উড়িয়ে দিতে চান; তিনি নচিকেতাকে অপর কোন বর নিতে বলিলেন, কেন না, জিজ্ঞাস্য বিষয় অত্যন্ত গূঢ় ও দুরূহ এবং দেবতারাও এ বিষয়ে শঙ্কা রাখেন। নচিকেতাও সামান্য জিজ্ঞাসু নহেন, বিষয়ের গূঢ়তা শুনেও তার উৎসাহ কমে গেল না; বরং জানিবার ইচ্ছা আরও প্রবল হ'য়ে উঠ্‌ল। নচিকেতা বলিল,—এ বিষয় ত আমি আপনার কাছে জান্‌তে চাচ্ছি; এ বিষয় আপনি ছাড়া আর কে ভালরূপে বুঝাইতে পারিবে? এর পর পুত্র, পৌত্র, হাতী, ঘোড়া, স্বর্ণ, বিশাল ভূমণ্ডল, দীর্ঘ জীবন, ইচ্ছানুকূল ভোগ, অনুপম রূপলাবণ্যবতী স্ত্রী, মনুষ্য লোকে দুর্লভ ভোগ সামগ্রী যমরাজ তাকে দিতে চাইলেন; কিন্তু নচিকেতা টলিলেন না, উপরন্তু বলিলেন,—

শ্বোভাবা মর্ত্ত্যস্য যদন্তকৈতৎ।
সর্ব্বেন্দ্রিয়াণাং জরয়ন্তি তেজঃ।
অপি সর্ব্ব-জীবিতমল্পমেব।
তবৈব বাহাস্তব নৃত্যগীতে॥

হে যমরাজ! ভোগ আগামী কাল থাকিবে কি না সন্দেহ, যে ভোগ অস্থির এবং ইন্দ্রিয়ের তেজ জীর্ণ, শীর্ণ, ক্ষীণ ক'রে দেয়, যে ভোগের পক্ষে সারা জীবনটাই অতি অল্প, সে ভোগ আমি চাই না; অতএব আপনার হাতী, ঘোড়া আর নাচ, গান আপনার কাছেই থাকুক, আমার কোন দরকার নাই।

নচিকেতার এইরূপ আদর্শ নিষ্কাম ভাব ও দৃঢ় নিশ্চয় দেখে যমরাজ খুব প্রসন্ন হ'য়ে নচিকেতার প্রসংশা করিতে করিতে বলিলেন,—হে নচিকেতা! তুমি প্রিয় বস্তু অর্থাৎ পুত্র ধন আদি ইষ্ট বস্তু এবং প্রিয়রূপ অপ্সরা আদি লোভনীয় ভোগগুলিকে অসার বুঝে ত্যাগ ক'রেছ; এই সকলে অধিকাংশ মনুষ্যই ডুবে থাকৃতে চায়; ধনীদের গতি অতি নিন্দনীয় বিবেচনায় উহাও তুমি ত্যাগ ক'রেছ; ধন্য তোমার নিষ্ঠা!!

যে মূর্খ টাকার মোহে অন্ধ হ'য়ে প্রমাদে ভুলে থাকে, তার পক্ষে পরলোকে মঙ্গল ঘটা অসম্ভব। এই লোকই আছে, পরলোক বলে কিছু নেই—এই যারা মানে, তারা বার বার আমার করাল গ্রাসে পতিত হয়, বার বার জন্মায় ও বার বার মরণ যাতনা ভোগ করে।

হে প্রিয়তম! তর্ক দ্বারা সম্যক্ জ্ঞান লাভ হয় না। তোমার ধারণা বড় চমৎকার, অতি সত্য; হে নচিকেতা! আমি যেন তোমার মত জিজ্ঞাসু সদা প্রাপ্ত হই। হে নচিকেতা! তুমি বুদ্ধিমান হ'য়ে ভোগের পরম অবধি, জগতে প্রতিষ্ঠা, যশের অনন্ত ফল, অভয়ের পরাকাষ্ঠা, স্তবের মহতী গতি ও প্রতিষ্ঠা দেখেও তাদের ধৈর্য্য পূর্ব্বক ত্যাগ ক'রেছ; সাবাশ! সাবাশ!!" এই সকল বাক্যে বেশ বোঝা যায় যে এ বিষয় বুঝতে হ'লে কত উচ্চ স্তরের অধিকারের আবশ্যক। এই প্রকারে নচিকেতাকে কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ'তে দেখে যমরাজ অতি আনন্দের সহিত তাকে আত্মার স্বরূপ সম্বন্ধে উপদেশ দিতে লাগিলেন।

যমরাজ বলিলেন,—এই নিত্য চিন্ময় আত্মা জন্মেও না, মরেও না; কোন বস্তু দিয়ে আত্মা তৈরী নন; নিজেও কিছু তৈরী করেন না; ইহা কারুর কার্য্য নয়, কারণ নয়, বিকারও নয়, বিকারীও নয়; আত্মা অজন্মা, নিত্য (সদাই আছেন) অনাদি, শাশ্বত (সদা রহনেবালা), অনন্ত ও পুরাতন;

দেহের বিনাশে বিনষ্ট হন না। সুতরাং আত্মা অমর যদি মরণশীল জীব আত্মাকে মরণশীল সিদ্ধান্ত করে, এবং যে মরেছে সে যদি আত্মাকে মরেছে বলে মনে করে, তবে তারা উভয়ে কেহই আত্মাকে জান্‌তে পারে নাই; কেননা, আত্মা মরেও না মারেও না। আত্মাকে না জেনে না চিনে যারা মৃত্যুমুখে পতিত হয়, নিজের কর্ম্ম ও জ্ঞানানুসারে তাদের মধ্যে কেউ কেউ দেব, মনুষ্য, পক্ষী আদি যোনি প্রাপ্ত হয়, আর কেউ কেউ বা বৃক্ষাদি স্থাবর ভাব প্রাপ্ত হয়।

যোনিমন্যে প্রপদ্যন্তে শরীরত্বায় দেহিনঃ।
স্থানুমন্যেঽনুসংযন্তি যথা কর্ম্ম যথাশ্রুতম্॥

এই মন্ত্রে পুনর্জন্ম প্রমাণ হয়।

গীতাতেও পরলোক বা পুনর্জন্ম প্রতিপাদক অনেক বচন পাওয়া যায় :—

ন ত্বেবাহং জাতু নাসং ন ত্বং নেমে জনাধিপাঃ।
ন চৈব ন ভবিষ্যামঃ সর্ব্বে বয়মতঃপরম্॥

এটা সত্য নয় যে, আমি কোন কালে ছিলাম না বা বর্ত্তমানে নাই বা ভবিষ্যতে থাক্‌ব না; সেইরূপ এই রাজারাও পূর্ব্বে ছিল না তা নয়, এবং ভবিষ্যতে আমরা সবাই থাক্‌ব না তাও নয়।

দেহিনোঽস্মিন্ যথা দেহে কৌমারং যৌবনং জরা।
তথা দেহান্তর-প্রাপ্তি র্ধীরস্তত্র ন মুহ্যতি।

যেমন জীবাত্মার এই দেহে বাল্য যৌবন বৃদ্ধাবস্থা হ'য়ে থাকে, সেইরূপ অন্য শরীর প্রাপ্তি ঘটে থাকে। কাজেই ধীর পুরুষ জীবের মৃত্যু দেখিয়া মোহিত হন না।

বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায় নবানি গৃহ্লাতি নরোঽপরাণি।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণা ন্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী॥

যেমন মানুষ জীর্ণ বস্ত্র ত্যাগ ক'রে নূতন বস্ত্র গ্রহণ করে, সেইরূপ জীবাত্মা পুরাতন শরীর ত্যাগ ক'রে নূতন শরীর গ্রহণ করে।

বহূনি মে ব্যতীতানি জন্মানি তব চার্জ্জুন।
তান্যহং বেদ সর্ব্বাণি ন ত্বং বেত্থ পরন্তপ॥

হে পরন্তপ অর্জ্জুন! তোমার এবং আমার অনেক জন্ম গত হয়ে গেছে;

তুমি সে সব কিছুই জান না, আমি কিন্তু সব জানি। গীতাতে স্বর্গাদি লোকের উল্লেখ আছে, পুনর্জন্ম, পরলোক আবৃত্তি অনাবৃত্তি, গতাগত, আদি শব্দ ও পাওয়া যায়। ষষ্ঠ অধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে—যোগভ্রষ্ট পুরুষ দীর্ঘকাল স্বর্গাদি লোকে বাস করিবার পর শুদ্ধাচরণশীল শ্রীমান পুরুষের ঘরে অথবা জ্ঞানবান যোগীর বংশে জন্ম গ্রহণ করে। ত্রয়োদশ অধ্যায়ে পুরুষের সৎ অসৎ যোনিতে জন্মের কথা উল্লেখ আছে। চতুর্দ্দশ অধ্যায়ে গুণানুসারে মানুষের উচ্চ, মধ্যও অধোগতি প্রাপ্তির কথা পাওয়া যায়। ১৫ অধ্যায়ে এক শরীর ছাড়িয়া অপর শরীর গ্রহণের কথা স্পষ্ট উল্লেখ আছে। ষোড়শ অধ্যায়ে ভগবান আসুরী সম্পদ সম্পন্নদিগকে বার বার তির্য্যক্ যোনিতে ও নরকে ফেলিবার কথা বলিয়াছেন। এই সকল বচন দ্বারা পুনর্জন্ম ও পরলোক সম্বন্ধে জ্ঞান পরিপুষ্ট হয়।

মহর্ষি পতঞ্জলি যোগসূত্রের সাধন পাদে বলেছেন,—

ক্লেশমূলঃ কর্ম্মাশয়োদৃষ্টদৃষ্টা জন্মবেদনীয়ঃ।

অর্থাৎ যার মূল হল ক্লেশ' কর্ম্মাশয় (কর্ম্মের বাসনাগুলি) বর্ত্তমান বা ভবিষ্যৎ জন্মের ভোগ (সুখ দুঃখ) ঘটায়; যোগশাস্ত্রে অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ দ্বেষ ও অভিনিবেশ (মৃত্যুভয়) এদের ক্লেশ বলে। এই সকল বাসনার ফল কিরূপে পাওয়া যায় সে সম্বন্ধে পতঞ্জলি বলিতেছেন,—

সতিমূলে তদ্বিপাকো জ্যত্যায়ুর্ভোগাঃ ॥ সাধন, ১৩

অর্থাৎ ক্লেশরূপ কারণ থাকলে ঐ সকল বাসনা গুলির ফল জাতি (যোনি) আয়ু (জীবনের পরিমাণ) ভোগ (সুখ দুঃখ) হইতে থাকে। মনুস্মৃতিতেও পুনর্জন্ম প্রতিপাদক অনেক বচন পাওয়া যায়; কোন্ কোন্ কর্ম্মের ফলে জীব কোন্ কোন্ যোনি প্রাপ্ত হয়, সে সম্বন্ধে মনু বলিতেছেন,—

দেবত্বং সাত্বিকা যান্তি মনুষ্যত্বং চ রাজসাঃ।
তির্য্যকত্বং তামসা নিত্যমিত্যেষা ত্রিবিধা গতিঃ ॥

অর্থাৎ সত্বগুণী দেবযোনি প্রাপ্ত হয়, রজোগুণী মনুষ্যযোনি প্রাপ্ত হয়, এবং তমোগুণী তির্য্যক যোনি প্রাপ্ত হয়। জীবের এই তিন প্রকার গতি হয়ে থাকে। যারা কেবল ইন্দ্রিয় তৃপ্তির জন্যই ব্যস্ত থাকে এবং ধর্ম্মাচরণে বিমুখ থাকে, ভগবান মনুর মতে সেই সকল নীচ মূর্খগণ মরণের পর নিন্দিত গতি

প্রাপ্ত হয়। ব্রহ্মহত্যা, সুরাপান, গুরুপত্নী-গমনাদি মহাপাপকারীরা অনেক বর্ষ নরক ভোগের পর নীচযোনি প্রাপ্ত হয়। যথা ব্রহ্মহত্যাকারী কুকুর, শুয়ার, গাধা, চণ্ডালাদি যোনি প্রাপ্ত হয়। ব্রাহ্মণ হইয়া মদ্যপায়ী হইলে কৃমি-কীট-পতঙ্গাদি ও হিংসক যোনিতে জন্ম লাভ হয়; গুরুপত্নীগামী তৃণ-গুল্ম-লতা আদি স্থাবর যোনিতে বার বার জন্মগ্রহণ করে; অভক্ষ্য ভক্ষণকারী কৃমিযোনি প্রাপ্ত হয়। (মনু স্মৃতি ১২ অঃ ৫৪—৫৬, ৫৮, ৫৯ শ্লোক দ্রষ্টব্য।)

পরলোক ও পুনর্জন্মের এই প্রকার প্রমাণে শাস্ত্রগ্রন্থ পরিপূর্ণ। এখন যুক্তি দ্বারা পুনর্জন্ম সুসিদ্ধ হয় কিনা, বিচার করা যাক।

১। শরীরের মত আত্মার পরিবর্ত্তন হয় না। সকলের শরীরে অবস্থানুসারে পরিবর্ত্তন ঘটে থাকে। আজ যে আমার শরীর আছে, কয়েক বর্ষ পরে তার সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন হয়ে যায়; পূর্ব্ব শরীর বদলে নূতন শরীর গড়ে উঠে; যেমন প্রথমে নখ, চুল কেটে ফেললে নূতন নখ চুল গজিয়ে ওঠে; বাল্যাবস্থায় আমার সকল অঙ্গ কোমল ও ছোট ছিল; মুখ ছোট ছিল; স্বর মিষ্ট ছিল; দাড়ি গোঁফ কিছু ছিল না। যৌবনকালে সেই শরীর কঠোর ও কঠিন হ'য়ে উঠলো, স্বর মোটা ও ভারী হয়ে পড়লো; মুখ বড় হয়ে গেল; দাড়ি গোঁফে বদন ভরে গেল। আবার বুড়ো বয়সে আমার অঙ্গ শিথিল হয়ে পড়ল, শরীরের সৌন্দর্য্য নষ্ট হতে লাগলো; চর্ম্ম লোল (ঢিলা) হয়ে পড়লো; চুল পেকে উঠ্‌ল; দাঁত পড়্‌তে লাগল, এবং পড়তে আরম্ভ হল; শরীর ও ইন্দ্রিয়ের শক্তি ক্ষীণ হয়ে পড়্‌ল। বালক অবস্থায় যে আমাকে দেখেছে, যৌবনে সে আমাকে দেখে হঠাৎ চিন্‌তেই পারে না। পরন্ত শরীর বদলালেও আমার আত্মা বদলায় না। দশ বর্ষ পূর্ব্বে যে আমার আত্মা ছিল, এখনও সেই আমার আত্মা আছে। আত্মার কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই। যদি হত, তাহলে দশ বর্ষ পূর্ব্বে যে সব ঘটনা আমার জীবনে ঘটেছিল, সেগুলি স্মরণ করিতে পারিতাম না। অপরে যাহা অনুভব করে, সেটা যেমন আমরা স্মরণ করতে। বা বুঝতে পারি না, তেমনি আত্মা যদি বদলাত, তাহ'লে বাল্যকালের ঘটনা (যাহা বাল্যকালের আত্মা অনুভব করেছে), যৌবনকালে স্মরণ করিতে পারিতাম না; কেন না, যৌবনের আত্মা বাল্যকালের আত্মা হইতে পরিবর্ত্তন হয়ে নূতন আত্মা হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু ব্যবহারিক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে,

আজকের ঘটনা দশ বা বিশ বর্ষ পরে আমরা স্মরণ করতে পারি। সুতরাং ইহাতে বুঝা যায়, যে স্মরণ করে আর যে অনুভব করে, তারা দু'জন নয়, এক জন। বর্ত্তমান জীবনে শরীরের এত পরিবর্ত্তনে যেমন আত্মার কোন পরিবর্ত্তন হয় না, তেমনি মরণের পর অপর শরীর প্রাপ্তি হলেও আত্মার কোন বদল বা পরিবর্ত্তন হয় না। সুতরাং ইহা দ্বারা আত্মার নিত্যতা সিদ্ধ হইল।

২। মানুষ নিজের অভাব (আমি নেই) কখন দেখে না ; 'আমি একদিন থাক্‌ব না'—এটা কখনও তার মনে আসে না ; অথবা আমি পূর্ব্বে ছিলাম না, —এ ভাবও তার মনে কখনও জাগে না। মানুষ সদাই ভাবে—'আমি সদাই আছি, এবং সদাই থাক্‌বো'। ইহাতেও আত্মার নিত্যতা সিদ্ধ হয়।

৩। শিশু জন্মেই কেঁদে উঠে ; জন্মাইবার পর কখন হাসে কখন কাঁদে কখন চুপ ক'রে শুয়ে থাকে। যখন মা শিশুর মুখে মাই গুঁজে দেন, তখন সে চুষ্‌তে আরম্ভ করে, দুধ টেনে খায় ; ধম্‌কালে ভয়ে কেঁপে উঠে ; হঠাৎ ঝপ্‌ করে শুইয়ে দিলে ভয়ে কঁপেতে থাকে। শিশুকে মাই চুষে খেতে কে শিখাল তার ভয়ের জ্ঞান কোথা থেকে এল ? এইগুলি পূর্ব্ব জন্ম প্রমাণ করে ; পূর্ব্ব জন্মে মাই চুষে খাওয়ার জ্ঞান ছিল বলেই শিশু সেই জ্ঞানবশে মাই চুষে খায়। পূর্ব্ব জন্মে ভয়ের উপলব্ধি ছিল ব'লেই শিশু এমন প্রতিকূল অবস্থায় ভয়ে কেঁপে উঠে। এজন্মে ত সে এসব ব্যাপার এখনও শিখে নাই। পূর্ব্ব জন্মের অভ্যাস বশে এসব ব্যাপার শিশুর মধ্যে স্বাভাবিকভাবে লিপ্ত বা সংশ্লিষ্ট ছিল। পূর্ব্ব জন্মের অনুভব করা সুখ দুঃখ স্মরণ করে শিশু হাসে বা কাঁদে ; পূর্ব্ব জন্মের অনুভব করা মৃত্যুভয় বশতঃ শিশু ভয়ে কাঁপে ; পূর্ব্ব জন্মে অনুভব করা মাই-চুষা জ্ঞান সঙ্গে সঙ্গে এসেছে বলেই শিশু এ জন্মে মাই চুষে দুধ টেনে খায়।

৪। জীবের মধ্যে যে সুখ দুঃখের ভেদ, প্রকৃতি ও গুণ কর্ম্মের ভেদ—কাম-ক্রোধ-রাগ-দ্বেষ আদির ন্যূনাধিকতা, ক্রিয়া ও বুদ্ধির ভেদ দেখা যায়, তাতেই পুনর্জন্ম মান্‌তে বাধ্য হতে হয়। একই মাতা পিতার সন্তান, এক সঙ্গে খায় দায়, এক সঙ্গে বেড়ায়, এক শিক্ষকের কাছে পড়ে, এক বিদ্যালয়ে যায় কিন্তু তাহাদের মধ্যে চরিত্রের বিলক্ষণতা দেখ্‌তে পাওয়া যায়। পূর্ব্বজন্মের সংস্কার ছাড়া এ বিচিত্রতার আর কোন হেতু নাই। একটা গ্রামোফোনের রেকর্ডে গান শুনে এই অনুমান করা যায় যে কেউ অন্যত্র এই গানটি গেয়েছে,

সেই আওয়াজ আমি আজ এখানে শুন্‌ছি, তেমনি কোন সুখী মানুষ দেখ্‌লে এই অনুমান হয় যে পূর্ব্বজন্মে এই লোকটী শুভকাজ করে এসেছে, যার ফলে আজ সে সুখী হয়েছে ; দুঃখী দেখিলে এই অনুমান করা হয় যে লোকটি পূর্ব্ব জন্মে অশুভ কার্য্য ক'রে উহার সংস্কার সঙ্গে করে এখানে এনেছে ; ফলে আমরা তাকে দুঃখীরূপে দেখ্‌ছি। স্বভাব গুণ বুদ্ধি সম্বন্ধে এইরূপে পূর্ব্বজন্ম টানিয়া আনিয়াই বিচার করতে হবে। যদি বল, সংস্কার ভেদের জন্য পূর্ব্বজন্ম টানিয়া না মেনে ঈশ্বরের ইচ্ছাকে হেতু মনে করলেইত চল্‌তে পারে। না, তা হয় না। ঈশ্বরকে এই বিচিত্রতার কারণ ধরে নিলে, তাঁর উপর বৈষম্য ও নির্দ্দয়তার দোষ আরোপ করা হয়। ঈশ্বর একজনকে সুখী একজনকে দুঃখী করেছেন বলিলে তাঁতে বৈষম্য দোষ এসে পড়ে। ঈশ্বর খেয়ালবশে একজনকে দুঃখী করেছেন—বল্‌লেই তাঁতে নির্দ্দয়তার দোষ এসে পড়ে। ঈশ্বরে কোন দোষ থাকিতে পারে না। পূর্ব্বকৃত কর্ম্মকেই স্বভাব ভেদের, ভোগ-বৈষম্যের কারণ মানতেই হবে। এই সকল উক্তিদ্বারা এই সিদ্ধ হয় যে প্রাণীর পুনর্জন্ম হয়ে থাকে। যখন পুনর্জন্ম সিদ্ধ হইল, তখন প্রশ্ন হচ্ছে যে এখন জীবের কি করা দরকার ? বিচারে বোঝা যায় যে, শাশ্বত এবং নিরতিশয় সুখের প্রাপ্তি এবং দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি জীব মাত্রেরই ধ্যেয় এবং এর জন্য মানুষের যত্নবান হওয়া চাই। শাস্ত্র পুনর্জন্মকে দুঃখের আগার স্বরূপ বলেছেন। এবং পরমাত্মা প্রাপ্তিই এই দুঃখ নিবৃত্তির একমাত্র উপায়। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গীতায় বলেছেন,—

মামুপেত্য পুনর্জন্ম দুঃখালয়মশাশ্বতম্।
নাপ্নবন্তি মহাত্মানঃ সংসিদ্ধিং পরমাংগতাঃ॥

'পরম সিদ্ধিপ্রাপ্ত মহাত্মাগণ আমাকে (ভগবানকে) প্রাপ্ত হয়ে দুঃখের আগার ও ক্ষণভঙ্গুর পরজন্মের হাত হতে চিরনিবৃত্তি পায়।' ইহাতে ইহাই সুসিদ্ধ হয় যে পরমাত্মা প্রাপ্তি চিরকালের জন্য দুঃখ নিবৃত্তির একমাত্র উপায়, এবং এই মনুষ্য জন্মেই সেটা সম্ভব। অতএব দুর্লভ মনুষ্যযোনি লাভ ক'রে যে পরমাত্মা প্রাপ্ত হ'য়ে যায় সেই সংসারে ধন্য বুদ্ধিমান ও চতুর। মনুষ্য জন্ম পেয়ে যে বিষয়ভোগে জীবন কাটিয়ে দেয়, সে অত্যন্ত জড়মতি ; শাস্ত্রে তাকে কৃতঘ্ন ও আত্মহত্যাকারী বলিয়া বর্ণনা করিয়াছে। শ্রীমদ্‌ভাগবতে ভগবান্‌ উদ্ধবকে বলছেন,—

নৃদেহমাদ্যং সুলভং সুদুর্লভং
প্লবং সুকল্পং গুরুকর্ণধারম্।
ময়ানুকূলেন নভস্বতেরিতং
পুমান্ ভবাব্ধিং ন তরেৎ স আত্মহা॥

অর্থাৎ এই মনুষ্যশরীর সমস্ত শুভফলপ্রাপ্তির আদি কারণ; এবং অত্যন্ত দুর্লভ হলেও ঈশ্বরের কৃপায় আমার পক্ষে সুলভ হইয়াছে; এই নরদেহ সংসার সমুদ্র পার হবার নৌকা স্বরূপ; আর সেই নৌকার নাবিক হচ্ছেন গুরু; গুরুই শুভমার্গে নৌকা চালিয়ে নিয়ে যান; শ্রীভগবান বায়ুরূপ ধরে সেই নৌকাকে জোরে জোরে চালাইতে সহায়তা করেন; এমন সুন্দর নৌকা পেয়ে যে মানুষ এই ভব সাগর পার না হয়, সে নিশ্চয়ই আত্মার হননকারী; তার পতন অবশ্যম্ভাবী।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে সংসার-সমুদ্র পারে যাবার জন্য আমাকে কি করতে হবে? এর উত্তর ভগবান স্বয়ং গীতায় দিয়াছেন,—

উদ্ধরেদাত্মনাত্মানং নাত্মানমবসাদয়েৎ

মানুষের চাই নিজের দ্বারা নিজেকে উদ্ধার করা; আর চাই, সে যেন অধোগতির দিকে গা না ঢেলে দেয়। উদ্ধারের অর্থ হচ্ছে উত্তম গুণ ও ভাবের সংগ্রহ, উত্তম আচরণের অনুষ্ঠান; পতনের অর্থ হচ্ছে দুর্গুণ ও দুরাচার গ্রহণ। কেননা এদের দ্বারাই মানুষের উত্তম বা অধম গতি হয়ে থাকে। সৎ গুণ, সৎ আচরণকে ভগবান গীতার যে ড়শ অধ্যায়ে দৈবী সম্পদ বলিয়াছেন এবং দুর্গুণ ও দুরাচারকে আসুরী সম্পদ বলিয়াছেন; এবং আরও বলেছেন যে, দৈবীসম্পদ মানুষকে মোক্ষমার্গে নিয়ে যায় (দৈবী সম্পদ্ বিমোক্ষায়), এবং আসুরী সম্পদ হচ্ছে বন্ধন, বার বার সংসার চক্রে টেনে নিয়ে আসে; (নিবন্ধায়াসুরী মতা)। শুধু তাই নয়, এই সকল অশুভ আচরণকারী, দ্বেষী, ক্রূর ও মানুষের মধ্যে অধম পুরুষদের ভগবান্ সংসারে বার বার পশু পক্ষী আদি তির্য্যক্ যোনিতে ফেলিয়া দেন এবং জন্ম জন্ম ধরে ঐ সকল নীচ যোনিতে থাকিয়া ভগবানকে না পাওয়ায় উহা হইতেও অধম গতি ঘোর নরকে যাইতে হয়। ইহা হইতে স্পষ্ট বোঝা যাইতেছে যে, উত্তম গুণ, ভাব ও আচরণ গ্রহণের যোগ্য এবং দুর্গুণ, দুর্ভাব ও দুরাচার ত্যাগের যোগ্য। গীতার ১৩অঃ

৭—১১ শ্লোকে ভগবান ইহাদিগকেই জ্ঞান ও অজ্ঞান নামে বর্ণনা করেছেন। জ্ঞানের নামে তথায় যে সকল গুণের বর্ণনা আছে, তাহারা আত্মার উদ্ধার কর্ত্তা—উচ্চ স্তরে জীবকে নিয়ে যায় ; আর ইহার বিপরীত যে সকল গুণ তারা জীবের পতন ঘটায় :—

অমানিত্বমদম্ভিত্বমহিংসা ক্ষান্তিরার্জবম্।
আচার্য্যোপাসনং শৌচং স্থৈর্য্যমাত্মবিনিগ্রহঃ ॥ ৭ ॥
ইন্দ্রিয়ার্থেষু বৈরাগ্যমনহঙ্কার এব চ।
জন্মমৃত্যুজরা-ব্যাধি-দুঃখদোষানুদর্শনম্ ॥ ৮ ॥
অসক্তিরনভিষ্বঙ্গঃ পুত্র-দার-গৃহাদিষু।
নিত্যঞ্চ সমচিত্তত্ব-মিষ্টানিষ্টোপপত্তিষু ॥ ৯ ॥
ময়ি চানন্য যোগেন ভক্তিরব্যচারিণী।
বিবিক্তদেশ-সেবিত্বমরতির্জন-সংসদি ॥ ১০ ॥
অধ্যাত্মজ্ঞান নিত্যত্বং তত্ত্ব-জ্ঞানার্থ-দর্শনম্।
এতজ্ জ্ঞানমিতি প্রোক্তমজ্ঞানং যদতোঽন্যথা। ১১॥

সদ্‌গুণ ও সদাচার কোন্‌টী, এবং দুর্গুণ ও দুরাচার কোন্‌টি—গ্রহণ করবার যোগ্য আচরণ কোন্‌টা, এবং ত্যাগ করবার যোগ্য আচরণ কোন্‌টা—শাস্ত্র দ্বারা উহা নির্ণয় করা যায়। শাস্ত্রই এ বিষয়ের প্রমাণ। ভগবান গীতায় বলেছেন,—

তস্মাচ্ছাস্ত্রং প্রমাণং তে কার্য্যাকার্য্যব্যবস্থিতৌ।
জ্ঞাত্বা শাস্ত্র-বিধানোক্তং কর্ম্মকর্ত্তুমিহার্হসি ॥

তোমার পক্ষে কোন্‌টা কর্ত্তব্য আর কোন্‌টা অকর্ত্তব্য—শাস্ত্রই তার ব্যবস্থা দেয় ও শাস্ত্রই তার প্রমাণ। ইহা জেনে শাস্ত্রবিধি অনুসারে কার্য্য করাই যোগ্য ব্যবস্থা। শাস্ত্র পড়েও অনেক সময় মুস্কিলে পড়্‌তে হয় ; পরস্পর বিরোধী বাক্য পড়ে বুদ্ধিভ্রম হ'তে পারে ; শাস্ত্রের তাৎপর্য্য নির্ণয় করা শক্ত হয়ে পড়ে ; সে সব ক্ষেত্রে মহাপুরুষেরা যে পথে গিয়াছেন, সেই পথ অবলম্বন করাই শ্রেয়ঃ ; ইহাই শাস্ত্রের বিধান ; তাই মহাভারতকার বলেছেন,—

তর্কোঽপ্রতিষ্ঠঃ শ্রুতয়ো বিভিন্না নৈকো মুনির্যস্য মতং ন ভিন্নম্।

ধর্ম্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াংমহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ ॥ বন—৩৭৩।১৭

অর্থাৎ তর্কে ঠাহর পাওয়া যায় না ; তর্কে সিদ্ধান্তে পৌঁছান ভার। তর্ক দ্বারা কোন প্রশ্নের নির্ণয় সম্ভব নয়। বেদ ভিন্ন ভিন্ন কথা বলেছেন ; যত মুনি তত মত ; এমন মুনি নাই যার মত ভিন্ন নহে ; সকলেই নিজ নিজ মত বলে থাকেন। ধর্ম্মের রহস্য বুদ্ধিরূপ গুহায় নিহিত ; সুতরাং ধর্ম্মের রহস্য অবগতির জন্য সেই মার্গ অবলম্বন করতে হয়, যে মার্গে প্রাচীন কালে শ্রেষ্ঠ সদাচারিগণ গমন করেছেন। তাঁদের আচরণকে আদর্শ মনে ক'রে নেওয়া চাই, এবং সেই আদর্শ অনুযায়ী সংসারে চলা চাই। যদি কারুর এই মহাপুরুষ প্রদর্শিত মার্গে সংশয় জাগে, তবে তার উচিত বর্ত্তমান কোন জীবিত মহাপুরুষের পথ (যাঁর প্রতি শ্রদ্ধা ভক্তি আছে এবং যাঁকে শ্রেষ্ঠ মহাপুরুষ বলে মনে করে) আদর্শ ধরে নিয়ে সেই পথে চলা। আর যদি কারুর উপর বিশ্বাস না থাকে, তবে নিজের অন্তরাত্মা—আপন বুদ্ধিকে পথ প্রদর্শক স্বীকার ক'রে নিতে হয়। নির্জ্জনে একান্তে বসে বিবেক বৈরাগ্যযুক্ত বুদ্ধি ও ধৈর্য্যের সহিত স্বার্থত্যাগ পূর্ব্বক নিরপেক্ষভাবে বিচার করতে হবে—আমার ধ্যেয় বস্তু কি, আমার কি করা চাই এবং কি কি করা চাই। এই প্রকার আপনার হিতাহিত বিচার ক'রে কোন্ বস্তু আমার গ্রহণ করা উচিত আর কোন বস্তু গ্রহণ করা উচিত নয়, সেটা নির্ণয় করে লও ; তারপর দৃঢ়তাপুর্ব্বক নির্ণীত বিষয়ে লেগে থাক। যে মার্গ বিচার ক'রে ঠিক ক'রে নিয়েছ, তাহাতে দৃঢ়তা পূর্ব্বক অগ্রসর হও ; আর যে আচরণ বিচারে নিষিদ্ধ ব'লে ঠিক করেছ, উহা প্রাণপণে ত্যাগ করিতে চেষ্টা কর। এই প্রকারে নিরপেক্ষ (নিষ্পক্ষ) ভাবে বিচার করলে ও অন্তরাত্মাকে জিজ্ঞাসা করলে এই উত্তর পাওয়া যাবে যে, অহিংসা, সত্য, ব্রহ্মচর্য্য এবং পরোপকারই শ্রেষ্ঠ ; হিংসা, অসত্য, ব্যভিচার এবং পরের অনিষ্ট করতে অন্তরাত্মা কখনও বলিবে না। এইরূপে আপনার লক্ষ্য স্থির ক'রে নাও, লক্ষ্য স্থির হ'বার পর তার বিপরীত আচরণ আর কখনও ক'র না। যখন ধ্যেয় বস্তু বেশ পরিষ্কারভাবে নির্দ্ধারিত হ'য়ে গেল, তখন ধ্যেয় বস্তুর দিকে লক্ষ্য রাখিয়া চলিতে থাক ; আত্মার উত্থান করতে থাক। আর যদি ধ্যেয় বস্তুর দিকে লক্ষ্য না রাখিয়া তার বিপরীত দিকে চলো, তবে আত্মার পতন হ'বে। যে আচরণ নিজের দৃষ্টিতে বা অপরের

দৃষ্টিতে হেয়, তা জেনে শুনে যদি কর, তা হ'লে নিজের গলায় নিজের হাতে ফাঁসি লাগিয়ে মরা হবে ; নিজের পায় নিজে কুড়ুল মারা হবে, নিজের হাতে নিজের অহিত করা হবে। এই জন্যই ভগবান বলেছেন, "নাত্মানমবসাদয়েৎ' ; জেনে শুনে নিজের পতন নিজে ঘটিও না।

শাস্ত্রে শরীর বাক্য ও মন সম্বন্ধে কয়েকটি দোষের উল্লেখ আছে, এবং তাদের উৎকর্ষ সাধনের জন্য কয়েকটি তপস্যার বিধি আছে। যে আত্মার উদ্ধার চায়, তার কায়িক, বাচিক ও মানসিক তপস্যার আচরণ করা দরকার। শরীর দ্বারা তিন প্রকার দোষ সাধিত হয় ; যথা দেওয়া হয় নাই এমন ধন গ্রহণ করা, বিধিরহিত হিংসা ও পরস্ত্রী গমন।

অদাত্তানামুপাদানং হিংসা চৈবাবিধানতঃ।
পরদারোপসেবা চ শারীরং ত্রিবিধং স্মৃতম্। মনু ১২।৭

বাচিক পাপ চার রকম :—কঠোর বচন বলা, মিথ্যা বলা, পরচর্চ্চা করা, মাথামুণ্ডহীন আবোল-তাবোল বকা।

পারুষ্যমনৃতং চৈব পৈশুন্যং চাপি সর্ব্বশঃ।
অসম্বদ্ধ-প্রলাপশ্চ বাঙ্‌ময়ং স্যাচ্চতুর্বিধম্॥ মনু ১২।৬

মানসিক পাপ তিন প্রকার, যথা :—কিসে পরের জিনিষ দাঁও মেরে নেওয়া যায় তার চিন্তা, মনে মনে অপরের অনিষ্ট চিন্তা করা, এই শরীরটাই হচ্ছি আমি, এইরূপ মিথ্যা অভিমান করা।

পরদ্রব্যেষভিধ্যানং মনসানিষ্টচিন্তনম্।
বিতথাভিনিবেশশ্চ ত্রিবিধং কর্ম্ম মানসম্॥ মনু ১২।৫

এই ত্রিবিধ পাপ নাশের জন্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গীতায় তিন প্রকার তপস্যার কথা বলেছেন—শারীরিক তপ, বাচিক তপ ও মানস তপ।

দেব-দ্বিজ-গুরু-প্রাজ্ঞ-পূজনং শৌচমার্জবম্।
ব্রহ্মচর্য্যমহিংসা চ শারীরং তপ উচ্যতে॥ ১৭অঃ ১৪।

দেবতা, ব্রাহ্মণ, গুরু (মাতাপিতা এবং আচার্য্যাদি) ও জ্ঞানীদিগের পূজা, পবিত্রতা, সরলতা, ব্রহ্মচর্য্য ও অহিংসা—এদের শরীর সম্বন্ধীয় তপস্যা বলে।

অনুদ্বেগকরং বাক্যং সত্যং প্রিয়হিতং চ যৎ।
স্বাধ্যায়াভ্যসনং চৈব বাঙ্‌ময়ং তপ উচ্যতে॥

১২

যে বাক্য উদ্বেগ ঘটায় না, প্রিয়, হিতকারক ও সত্য, বেদ শাস্ত্র পাঠ ও পরমেশ্বরের নাম জপের অভ্যাস—এই গুলিকে বাক্য সম্বন্ধী তপ বলে।

মনঃ প্রসাদঃ সৌম্যত্বং মৌনমাত্মবিনিগ্রহঃ।
ভাবসংশুদ্ধিরিত্যেতৎ তপো মানসমুচ্যতে ॥

মনের প্রসন্নতা, শান্তভাব, ভগবচ্চিন্তন, মনের নিগ্রহ ও অন্তঃকরণের পবিত্রতা—এই গুলি মন সম্বন্ধী তপস্যা বলে।

প্রত্যেক কল্যাণকামী পুরুষের উপরিউক্ত তিন প্রকার তপস্যা সাত্বিক ভাবের সহিত অভ্যাস করা কর্ত্তব্য।

পরমাত্মার আশ্রয় লইয়া বিবেক ও বৈরাগ্যযুক্ত বুদ্ধি দ্বারা দুঃখ, শোক ভয় ও চিন্তা ত্যাগ করাই দুঃখপূর্ণ সংসার থেকে উদ্ধারের সর্ব্বোত্তম উপায়। ইহাতে যদি কেউ বলে যে, সুখ ও দুঃখ ভোগ প্রারব্ধ বশেই ঘটে থাকে, সুতরাং উহা হইতে অব্যাহিত লাভের উপায় নাই, ইহার উত্তর হচ্ছে এই যে, সুখ-দুঃখের নিমিত্ত-কারণ প্রাপ্তি প্রারব্ধের ফল বটে; সেই নিমিত্ত প্রাপ্তি হলে আমার যে চিন্তা, শোক, ভয় ও বিপদ দেখা দেয়, সেটা আমারই মূর্খতার জন্য ঘটে, অজ্ঞানতাই তার কারণ; প্রারব্ধ তার কারণ নয়। পুত্র-বিয়োগ টাকাকড়ি চুরি যাওয়া, ব্যবসায়ে ক্ষতি হওয়া, মান সম্ভ্রম নষ্ট হওয়া, অসুখ বিসুখ হওয়া, অপকীর্ত্তি ঘটা—এ সকল ঘটার কারণ প্রারব্ধই বটে; কিন্তু এই সকল ঘটনায় আমার যে বিষাদ উৎপন্ন হয়, তাহার কারণ আমার অজ্ঞান, প্রারব্ধ নয়। যদি আমি নিজে এই সকল ঘটনা দ্বারা দুঃখী না হই, তবে ঘটনার সাধ্য নাই যে আমায় দুঃখী করে। যদি ঘটনাগুলির মানুষকে দুঃখী ক'রবার শক্তি থাকত, তা' হ'লে জ্ঞানীদিগেরও ঐ সকল ঘটনায় পড়্‌লে দুঃখ হ'ত; পরন্তু শাস্ত্র বলিতেছেন, জ্ঞানী জীবন্মুক্ত মহাপুরুষ খুব অপ্রিয় ঘটনায়ও দুঃখ বোধ করেন না, তাঁরা সদাই সুখ-দুঃখের পরপারে থাকেন। শ্রুতিও বলিতেছেন, 'তরতি শোকমাত্মবিৎ।' আত্মজ্ঞানী কখন শোক করেন না। হর্ষ শোকৌ জহাতি—জ্ঞানী পুরুষ হর্ষ শোক ত্যাগ করে। 'তত্র কো মোহঃ কঃ শোক একত্বম্ অনুপশ্যতঃ—সর্ব্বত্র এক পরমাত্মাকে যিনি দেখেন, সেই আত্মদর্শী পুরুষের জন্য শোক মোহের কারণ থাকে না। গীতায়ও ভগবান বলিয়াছেন,—

অশোচ্যানন্বশোচস্ত্বং প্রজ্ঞাবাদাংশ্চ ভাষসে। •
গতাসূনগতাসূংশ্চ নানুশোচন্তি পণ্ডিতাঃ ॥

শোকের অযোগ্য মানুষের জন্য তুমি শোক করিতেছ, অথচ পণ্ডিতের মত বচন বলিতেছ; যার প্রাণ গত হয়েছে বা যার প্রাণ আছে এমন কাহারও জন্য পণ্ডিতেরা শোক করেন না।

ইহা দ্বারা ইহাই প্রতিপন্ন হ'ল যে শোক করা না করা আমার হাতে। যদি তা না হ'ত, প্রারব্ধই যদি এর হেতু হ'ত, তা' হ'লে জ্ঞানোত্তরকালে জ্ঞানীরও শোক হত, এবং ভগবানও শোক ছাড়বার জন্য কখন অর্জ্জুনকে কিছু বলতেন না। শরীরের উৎপত্তি, বিনাশ, ক্ষয়বৃদ্ধি, সাংসারিক পদার্থের সংযোগ-বিয়োগ প্রারব্ধের ফলেই ঘটে থাকে, অজ্ঞানই তার কারণ। সাংসারিক বিপত্তি ঘট্‌লেও যদি কেউ শোক না করে, না কাঁদে তাতে তার কোন ক্ষতি হয় না। সুতরাং পরমেশ্বরের শরণ গ্রহণ করে শোক মোহ, বিষাদ, চিন্তা ও ভয় ত্যাগ ক'রে সাধকের পক্ষে পরমাত্মার স্বরূপে অচলভাবে স্থিতি লাভ করাই চাই।

১৩ই আশ্বিন, ১৩৪৭।

ব্রহ্মবিদ্যা বিচার

জয়তি ভুবনবীজং জ্যোতিরেকং মুরারেঃ
হৃদয়নিহিতমাত্রে যত্র সংসার-যন্ত্রম্।
গলতি গলিতমোহে শাশ্বদানন্দসান্দ্রম্
যদভিদধতি বেদাস্তৎ প্রপঞ্চস্য চক্ষুঃ ॥
বটবিটপিসমীপে ভূমিভাগে নিষণ্ণং
সকলমুনিজনানাং জ্ঞানদাতারমারাৎ।
ত্রিভুবনগুরুমীশং দক্ষিণামূর্ত্তি দেবং
জননমরণদুঃখচ্ছেদ-দক্ষং নমামি ॥

নমো নমস্তে গুরবে মহাত্মনে
বিমুক্তসঙ্গায় সদুত্তমায়।
নিত্যাদ্বয়ানন্দরসস্বরূপিণে
ভূম্নে সদাপারদয়াম্বুধাম্নে ॥

উপনিষদ্ ও গীতাকে মোক্ষশাস্ত্র মধ্যে প্রধান বলে গণ্য করা হয়। উপনিষদ্ কথাটির ব্যুৎপত্তিগম্য অর্থই হচ্চে ব্রহ্ম-বিদ্যা। 'উপ' কিনা সমীপে প্রত্যগভিন্নরূপে) ব্রহ্মতত্ত্বের সাক্ষাৎকার করিয়ে 'নি' কিনা উত্তমরূপে অজ্ঞান-সহিত দ্বৈত-প্রপঞ্চের বিধ্বংসকারী বিদ্যাই হচ্চে উপনিষদ্। ষদ্ ধাতুর অর্থ গতি (জ্ঞান, প্রাপ্তি), অবসাদন (বিধ্বংস) আদি নানা প্রকার অর্থ হ'তে পারে। মুণ্ডকশ্রুতি বলেন, ব্রহ্মবিদ্যাই সর্ব্ব বিদ্যার প্রতিষ্ঠা 'ব্রহ্মবিদ্যাং সর্ব্ববিদ্যা-প্রতিষ্ঠাম্' (১।১।১), অর্থাৎ ব্রহ্মবিদ্যা বিনা যোগাদি অন্যান্য বিদ্যা সকল পূর্ণরূপে সফলতা প্রাপ্ত হয় না। ভগবতী গীতাকেও ব্রহ্মবিদ্যা বলিয়া বিদ্বানেরা মনে করেন। সেইজন্য গীতাকে উপনিষদ্রূপ গাভীর অমৃতময় দুগ্ধ মনে করা হয়। 'সর্ব্বোপনিষদো গাবঃ' ইত্যাদি। 'পার্থায় প্রতিবোধিতাম্' ইত্যাদি গীতার ধ্যান-শ্লোকে 'অদ্বৈতামৃতবর্ষিণী' বিশেষণটি গীতা যে ব্রহ্মবিদ্যা তার পুষ্টিসাধন করছে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নিজে বলছেন,—

রাজবিদ্যা রাজগুহ্যং পবিত্রমিদ-মুত্তমম্।
প্রত্যক্ষাবগমং ধর্ম্ম্যং সুসুখং কর্ত্তুমব্যয়ম্ ॥

ব্রহ্মবিদ্যাই রাজবিদ্যা অর্থাৎ সকল বিদ্যার রাজা ; ইহা গোপনীয় মন্ত্রাদি সমস্ত সাধনার রাজা পরম গোপনীয়, পবিত্র ও উত্তম, উহার স্বরূপ এবং ফল প্রত্যক্ষ ; ইহা ধর্ম্ম-সংযুক্ত, সনাতন উহার সাধনা সুখে সম্পন্ন করা যেতে পারে, দুঃখের সহিত নহে।

তমেব বিদিত্বাতি-মৃত্যুমেতি।
নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায় ॥ শ্বেঃ উপঃ ৩।৮।

পরমাত্মাকে জেনে মুমুক্ষু মৃত্যু অতিক্রম করে ; কল্যাণের জন্য আত্মজ্ঞান ছাড়া অন্য পথ নাই।

'জ্ঞাত্বা দেবং মুচ্যতে সর্ব্বপাশৈঃ'। শ্বেঃ উপঃ ৬।১৩

পরমাত্মদেবকে জান্লেই সকল বন্ধন থেকে মুক্তি পাওয়া যায়।

সর্ব্বং জ্ঞানপ্লবেনৈব বৃজিনং সন্তরিষ্যসি। গী: ৪।৩৬

জ্ঞানরূপী নৌকা অবলম্বনে সমস্ত পাপরূপ সমুদ্র পার হওয়া যায়।

—ইত্যাদি উপনিষদ্ এবং গীতার অনেক বচন থেকে বেশ বুঝতে পারা যায় যে, ব্রহ্মবিদ্যাই মোক্ষের সাক্ষাৎ শ্রেষ্ঠ সাধন।

ব্রহ্ম বল্‌তে আমরা কি বুঝি, তার একটা ধারণা সাধকের থাকা দরকার। ব্রহ্ম সর্ব্বাত্মা—সকলের আত্মা। "বৃহত্ত্বাৎ বৃংহণত্বাচ্চ ব্রহ্ম আত্মেতি গীয়তে—সকলের চেয়ে মহান বলেই এবং শরীরাদি অনাত্ম পদার্থকে সত্তা-স্ফূর্ত্তি দিয়ে থাকেন বলেই ব্রহ্মকেই আত্মা বলা হয়। মাতা পিতা সন্তানের হিত-কামনা করেন; কিন্তু শ্রুতি (বেদ) তাঁদের চেয়েও বেশী হিতাকাঙ্ক্ষী; সেই ভগবতী শ্রুতি এই আদেশ ক'রছেন,—

একো দেবঃ সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ঃ
সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা।
কর্ম্মাধ্যক্ষঃ সর্ব্বভূতাধিবাসঃ।
সাক্ষী চেতা কেবলো নির্গুণশ্চ॥ শ্বেঃ উপঃ ৬।১১

শরীরাদি সমস্ত ভূতের মধ্যে স্বপ্রকাশ এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মই আত্মারূপে বিরাজমান। তিনি অবিদ্যা দ্বারা আচ্ছন্ন; ইহার কারণ "গূঢ়" অর্থাৎ সকল জীব তাহা জানে না। যদি জীবের সহিত ব্রহ্মের সম্বন্ধ না থাকে, তাহলে জীব তাঁকে জান্‌বে কি ক'রে? এবং জীব হইতে ভিন্ন হবার কারণই বা বুঝবে কি ক'রে? ব্রহ্ম 'সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বভূতান্তরাত্মা"। সর্ব্বব্যাপী হওয়ায় জীবের সহিত তাঁর অসম্বন্ধ হতে পারে না। সমস্ত চরাচর ভূত সকলের প্রত্যক্ সাক্ষী, আন্তর আত্মস্বরূপ হওয়ায় জীব হ'তে ভিন্নও হ'তে পারেন না। এইজন্য তাঁর মায়াবৃত হবার কারণ গূঢ় বলা যায়। গীতা বলিতেছেন,—

নাহং প্রকাশঃ সর্ব্বস্য যোগমায়াসমাবৃতঃ। ৭।২৫

'সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ঃ' বলায় আধার-আধেয় ভাব জেগে উঠে; তা'হলে আকাশাদি ভূত হ'তে ব্রহ্ম পৃথক ইহাই শঙ্কা হয়। না তা নয়; 'সর্ব্বভূতাধিবাস' বলার মানে কি? 'অধিবাস' কথার অর্থ অধিষ্ঠান। অধিষ্ঠান রূপ সাক্ষী আত্মাতে সমস্ত আকাশাদি ভূত কল্পিত হয়। কল্পিত পদার্থ অধিষ্ঠান হইতে অতিরিক্ত সিদ্ধ হয় না।

বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং মৃত্তিকেত্যেব সত্যম্।

এই ছান্দোগ্য শ্রুতিতে মৃত্তিকাদি দৃষ্টান্ত দ্বারা একমাত্র মূল তত্ত্বেরই সত্য মানা হয়েছে, ঘটাদি কার্য্যের আধার মৃত্তিকা; উহা হইতে ঘটাদি পৃথক্ ইহা সিদ্ধ হয় না। সেইরূপ অধিষ্ঠান ব্রহ্মই সত্য ও সনাতন। তিনি কেবল ও নির্গুণ, অর্থাৎ গুণাতীত এবং দৃশ্য প্রপঞ্চ হ'তে অতীত, নির্বিশেষ চিন্মাত্র। এইজন্য মুমুক্ষুর এই কর্ত্তব্য।

যদ্‌যৎ পশ্যতি চক্ষুর্ভ্যাং তত্তদাত্মেতি ভাবয়েৎ।
যদ্‌যচ্ছৃণোতি কর্ণাভ্যাং তত্তদাত্মেতি ভাবয়েৎ॥
দৃষ্টিং জ্ঞানময়ীং কৃত্বা পশ্যেদ্ ব্রহ্মময়ং জগৎ।

যা কিছু চোখে দেখা যায়, সে সমস্তই আত্মা—এই ভাবনা কর; যা কিছু কাণে শুনছ, সে সব আত্মা—এই ভাবনা কর। দৃষ্টিকে অদ্বৈতাত্ম জ্ঞানময়ী তৈরী করে ফেল, এবং সমস্ত বিশ্বকে ব্রহ্মময় দেখ্‌তে শেখ।

ব্রহ্মবিদ্যা কাকে বলে? সংশয় ও বিপরীত ভাবনা রহিত "অহং ব্রহ্মাস্মি" 'আমিই পূর্ণব্রহ্ম'—এইরূপ অখণ্ড ব্রহ্মাকার বৃত্তির নাম ব্রহ্মবিদ্যা। এই বিদ্যা অবিদ্যা নাশ ক'রে মুমুক্ষুকে মুক্তি দান করে। শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসনএর পরিপক্ক অবস্থায় অখণ্ড ব্রহ্মাকার বৃত্তির উদ্‌ভব হয়। প্রথমে যে শ্রবণ মননাদি হয়, সেটা ঔৎসুক্য প্রেরিত সুতরাং অনভব শূন্য; তাকে নকল বলা যেতে পারে। পশ্চাৎ সেই নকল শ্রবণ-মননে বিশেষভাবে লেগে থাকলে, ক্রমে অনুভব হ'তে থাকে, তখন নকল আসলে পরিণত হয়। কোন কার্য্যই প্রথমেই আসল হয় না; নকলের ভিতর দিয়েই আসলে পৌঁছিতে হয়। প্রথমে নকল ডাক্তার হতে হয়, পরে "শতমারী চিকিৎসক" অভ্যাস ও অভিজ্ঞতা অধিক হ'লে, তখন আসল ডাক্তার হয়। এই রকম প্রথমে নকল ভক্ত হতে হয়, ফুল ছোঁড়াছুঁড়ি করতে হয়, ফোটা কাটতে হয়, তিলক ধারণ ক'রে চিতাবাঘ সাজ্‌তে হয়, তারপর জ্ঞান বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অনুভব হতে থাকে, তখন নকল ভক্ত আসলে পরিণত হয়। প্রথমে নকল জ্ঞানী হতে হয়, তারপর আসল জ্ঞানী। এরজন্য প্রথমে অনুভব না হলেও গুরু ও শাস্ত্র বচনে দৃঢ়তম শ্রদ্ধা রাখতে হয় এবং 'অহং ব্রহ্মাস্মি', 'সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম', 'বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি' ইহার অভ্যাস সদা করতে হয়।

এই রকম চিন্তা করতে থাকলে শনৈঃ শনৈঃ দ্বৈত-ভ্রান্তির নাশ হ'তে থাকে এবং অদ্বৈত ব্রহ্মতত্ত্বের প্রকাশ হতে থাকে। তাই পঞ্চদশীতে দেখ্‌তে পাই,—

অনুভূতেরভাবেঽপি ব্রহ্মাস্মীতি বিভাবয়েৎ।

অপ্যসৎ প্রাপ্যতে ধ্যানান্নিত্যাপ্তং ব্রহ্ম কিং পুনঃ।

অনুভব না হলেও 'আমিই ব্রহ্ম' একথা মুখে বলতে হয় ও মনে ভাবতে হয়। ধ্যানের দ্বারা অসৎ বস্তু, অবিদ্যমান বস্তুও পাওয়া যায়, সদা প্রাপ্ত স্বস্বরূপ ব্রহ্ম ধ্যানের দ্বারা কেন পাওয়া যাবে না ?

প্রশ্ন—'অহং ব্রহ্মাস্মি'—এটা অহঙ্কার, এটা অভিমান, অহঙ্কারাদি বন্ধনের হেতু, মুক্তির কারণ নহে।

উত্তর—'অহং ব্রহ্মাস্মি' এই ভাবনা শুদ্ধ অহঙ্কার ; ইহা বন্ধনের কারণ হতে পারে না। 'আমি এই দেহ' এটা মলিন অহঙ্কার ; শুদ্ধ অহঙ্কারের দ্বারা মলিন অহঙ্কার নষ্ট হয়। মলিন অহংকার বা অভিমান বন্ধনের কারণ। 'অহং ব্রহ্মাস্মি' ভাবনায় মলিন অহংকার দূর হয়, 'দেহাদি আমি নই' এ জ্ঞান ফুটে ওঠে। মলিন অহঙ্কার নিজেকে উৎকৃষ্ট সর্ব্বোত্তম ও অপরকে নিকৃষ্ট অধম মনে করে। যে অহঙ্কার সকলকে ব্রহ্মরূপ মনে করে, বহুকে একে বিলয় করে, ব্রহ্ম ভিন্ন বস্তুর স্বতন্ত্র সত্তার খণ্ডন করে, সে অহঙ্কার বস্তুতঃ লোক প্রসিদ্ধ অহঙ্কার নহে। এইজন্য মুমুক্ষুর এবং তত্ত্বদর্শীর "অহং ব্রহ্মাস্মি' এই বৈদিক ভাবনা অতি পবিত্র ও শুদ্ধ, আনন্দময়ী ও শান্তিদাত্রী এবং সংসার সাগর পার করিবার সাক্ষাৎ ব্রহ্মবিদ্যা। সেই জন্য (তেজবিন্দুপনিষদ্) 'অহং ব্রহ্মাস্মি' এই ভাবনার মহত্ত্ব মুক্তকণ্ঠে গান করেছেন। এর জন্য মুমুক্ষু এই নিশ্চয় করে—

"তিন অবস্থা, তিন গুণ, তিন দেহ বিস্তার।

উন্‌কা দ্রষ্টা এক মৈঁ, তিনোঁ হীসে পার।"

ছান্দোগ্য উপনিষদে ব্রহ্মবিদ্যাকে ভূমবিদ্যা নাম দেওয়া হয়েছে। 'ব্রহ্ম' ও 'ভূম' এর অর্থ এক পরিপূর্ণ ব্যাপক বা মহান্। ভূমবিদ্যা সনৎকুমার ও নারদ সংবাদে বর্ণিত হয়েছে। উহা বিশেষরূপে মননীয় ও হৃদ্রুচিকর। নীচে উহার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেওয়া গেল।

কোন সময়ে দেবর্ষি নারদ সমিৎপাণি হয়ে ভগবান সনৎকুমারের কাছে

গিয়ে প্রণামাদির পর প্রার্থনা ক'রলেন,—'ভগবন্! আমাকে ব্রহ্ম-বিদ্যা তথা আত্মজ্ঞানের উপদেশ দিন'। সনৎকুমার ব'ললেন -'নারদ! আপনি কি জানেন আগে তাই বলুন; এবং কোন্ কোন্ বিদ্যায় আপনার পারদর্শিতা আছে, প্রথমে সেটা জান্‌তে চাই।'

নারদ—'হে ভগবন্! ঋগ্‌বেদ, যজুর্ব্বেদ, সামবেদ, অথর্ব্ববেদ, ইতিহাস, পুরাণ, ব্যাকরণশাস্ত্র, শ্রাদ্ধকল্প, গণিতশাস্ত্র, উৎপাতাদিবোধকশাস্ত্র, তর্কশাস্ত্র, নিধিশাস্ত্র, নীতিশাস্ত্র, নিরুক্ত, শিক্ষা, কল্প, ছন্দ আদি, ধনুর্ব্বিদ্যা, ভূতবিদ্যা, ক্ষত্রবিদ্যা, নক্ষত্রশিল্পাদি বিদ্যা, জ্যোতিষশাস্ত্র, সর্পদেবজনবিদ্যা, নৃত্য-গীত-বাদ্য-শিল্পাদি বিদ্যা, ইত্যাদি বিবিধ বিদ্যা আমি বেশ ভাল রকমই জানি'।

'পরন্তু ভগবন্! আমি কেবল বেদাদি শাস্ত্রের শব্দার্থই জানি; আত্মার সহিত আমার সাক্ষাৎকার হয় নাই; সেইজন্য আমার বড় দুঃখ, আমি শোকগ্রস্ত। ব্রহ্মনিষ্ঠ মহাত্মাগণের কাছে শুনেছি—'তরতি শোকমাত্মবিৎ' —আত্মবেত্তা শোক হইতে ত্রাণ পায়; সে নির্মোহ, নির্ভয় এবং পরমানন্দে মগ্ন হয়ে যায়। আমি যখন শোক দুঃখ ভোগ করি, তখন আমার আত্মজ্ঞান হয় নাই, আমি আত্মবেত্তা নহি। তাই আপনার কাছে প্রার্থনা করছি—ভগবন্! কৃপা-নিধান! আমাকে ব্রহ্ম-বিদ্যার উপদেশ দিন। আপনার মত শ্রোত্রিয় ব্রহ্মনিষ্ঠ আচার্য্যের উপদেশ বিনা আমার ব্রহ্মবিদ্যা লাভ হবে না। আপনি ব্রহ্ম-বিদ্যার আচার্য্য ব্রহ্মনিষ্ঠ বিরক্ত মহাত্মা, এবং আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। ব্রহ্ম-বিদার মত অমূল্য পবিত্র বস্তু আপনার প্রিয়যোগ্য শিষ্যকে দিয়ে থাকেন। অতএব ভগবান কৃষ্ণ যেমন আপনার প্রিয় সখা ভক্ত অর্জ্জুনকে, ভগবান কপিলদেব যেমন নিজের পূজ্যা মাতা দেবহূতিকে, এবং মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য যেমন আপন পিয়ারী ধর্ম্মপত্নী মৈত্রেয়ীকে ব্রহ্ম-বিদ্যার উপদেশ দিয়াছিলেন, সেই রকম আমাকেও আপনি ব্রহ্ম-বিদ্যার উপদেশ দিয়া কৃতার্থ করুন।"

নারদের এই প্রকার হার্দ্দিক নিষ্কপট তীব্র ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা দেখে সনৎকুমার আপন মনে এই রকম বিচার করতে লাগলেন 'যদিও নারদ সকল শাস্ত্রবেত্তা বটে, তবুও শাস্ত্রের বিবিধ বিষয়ের আপাততঃ পরস্পর বিরোধ সমাধান করতে পারে নাই, সংশয় জন্মেছে। ইহার পরমাত্মতত্ত্ব যথার্থ ফুটে উঠে নাই। ইনি বিপরীত ভাবনাগ্রস্ত;

উপনিষদে নদী-সমুদ্র দৃষ্টান্তে দ্বারা বর্ণনা করা হয়েছে। কঠ শ্রুতিও জলের দৃষ্টান্ত দ্বারা উহার নির্দ্দেশ করিয়াছেন,—

যথোদকং শুদ্ধে শুদ্ধ-মাসিক্তং তাদৃগেব ভবতি।
এবং মুনের্ব্বিজানত আত্মা ভবতি গৌতম ॥

যমরাজ নচিকেতাকে বল্‌ছেন—'হে গৌতম! যেমন শুদ্ধ জল বিশুদ্ধ জলের সহিত মিশালে তদ্রূপ (এক) হয়ে যায়, সেই রকম আত্মজ্ঞানী মুনির শুদ্ধ আত্মা পরমাত্মাতে মিশে তদ্রূপ (এক) হয়ে যায়।'

এই প্রকার ভেদের রূপে লীন হয়ে যায়; মুক্ত অবস্থায় কোন প্রকার ভেদের নাম গন্ধও থাকে না। সব শাস্ত্রের তাৎপর্য্যই এই।

অনাদি সুখরূপতা নিখিলদৃশ্য-নির্মুক্ততা।
নিরন্তরমনন্ততাস্ফুরণরূপতা চ স্বতঃ॥
ত্রিকালপরমার্থতাত্রিবিধ-ভেদ-শূন্যান্ততা।
মম শ্রুতিশতার্পিতা ভদহমস্মি পূর্ণো হরিঃ॥
ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ হরিঃ ওঁ॥

১২ অগ্রহায়ণ, ১৪৭ শান্তি আশ্রম, চুচুঁড়া পোঃ।

উপাসনার ভেদ বিচার

মানুষ মাত্রেই উপাসনা করে থাকে; কেউ ধন দৌলতের উপাসনা করে, কেউ কামিনী-কাঞ্চনের উপাসনা করে; কেউ দেব-দেবীর উপাসনা করে; কেউ সাকারের উপাসক, কেউ বা নিরাকারের উপাসক। রুচি ভেদে উপাসনার ভেদ দেখ্‌তে পাওয়া যায়। কেউ বা ফুল চন্দনে দেব-দেবীর উপাসনায় বসেন; কেউ বা বিশিষ্ট আসনে নিবিষ্ট মনে বসিয়া ইষ্ট দেবতার ধ্যান করেন। উপাসনা ও সাধনা সম পর্য্যায়ভুক্ত। উপাসনা ছাড়া ভক্ত নাই, সাধনা বিনা সাধক নাই। উপাসনা শব্দের অর্থ বড় ব্যাপক। যাহা দ্বারা শান্তি পাওয়া যায়, যাহা দ্বারা সংসারের জ্বালা মালা থেকে মুক্তি মেলে, যাহা দ্বারা ভগবৎ প্রাপ্তি ঘটে, তাহাকেই প্রকৃত উপাসনা বলে। ভগবৎপ্রাপ্তির জন্য শাস্ত্রে অনেক প্রকার উপাসনার কথা বলা হয়েছে। তাদের মধ্যে

যে গুলি সরল সহজ ও সুগম, তাদের কিছু পরিচয় দেওয়া যাইতেছে। বিবেক দৃষ্টিতে বিচার ক'রলে সব উপাসনাগুলিকে সব সাধনগুলিকে দু'ভাগে ভাগ করা যেতে পারে; ১। জ্ঞান নিষ্ঠা। ২। যোগ নিষ্ঠা। সকল উপাসনাই এই দুই নিষ্ঠার অন্তর্গত। জীবাত্মা ও পরমাত্মার ঐক্যের উপর নির্ভরশীল যত কিছু সাধনা সেগুলি জ্ঞান নিষ্ঠার অন্তর্গত এবং জীবাত্মা ও পরমাত্মার ভেদের উপর নির্ভরশীল যত কিছু সাধনা, তারা যোগ নিষ্ঠার অন্তর্গত। এই বিবেক দৃষ্টি থেকেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গীতায় অভেদ নিষ্ঠাকে জ্ঞান যোগ নামে অভিহিত করেছেন, এবং ভেদ নিষ্ঠাকে যোগ, কর্ম্মযোগ, ভক্তিযোগ আদি নামে ব্যাখ্যা করেছেন। শ্রীমদ্ ভাগবতেও অভেদ ও ভেদ নিষ্ঠার বিশদ বর্ণনা পাওয়া যায়।

বেদ ও উপনিষদে 'অহং ব্রহ্মাস্মি' 'তত্ত্বমসি' আদি মহাবাক্যগুলি অভেদ নিষ্ঠার পরিচায়ক এবং 'দ্বা সুপর্ণা' আদি শ্রুতি বাক্য ভেদ নিষ্ঠার প্রতিপাদক। এই রকমে শ্রুতি, স্মৃতি, ইতিহাস, পুরাণ আদি বৈদিক সনাতন ধর্ম্মের প্রায় সকল আর্য্য গ্রন্থে ভেদ নিষ্ঠার ও অভেদ নিষ্ঠার (ভেদোপসনার ও অভেদোপা-সনার) বর্ণনা দেখ্‌তে পাওয়া যায়।

১। অচিন্ত্য ব্রহ্মের উপাসনা ঃ—চোখ যা দেখে, কান যা শোনে, সে গুলিক্ষণস্থায়ী, সদা স্থায়ী নয়। ইন্দ্রিয়গুলি যা অনুভব করে, সেগুলি ক্ষণ স্থায়ী, ক্ষণ ভঙ্গুর ও মিথ্যা। মন যা কিছু চিন্তা করে, সেগুলিও ক্ষণস্থায়ী ও স্বপ্নবৎ অলীক। অনুভব ও চিন্তনকারী ইন্দ্রিয় ও মনের সহিত সম্পূর্ণ দৃশ্যটাই ক্ষণভঙ্গুর ও স্বপ্নবৎ মিথ্যা। কবি সত্যই বলিয়াছেন,

সংসার স্বপন ভাঙিল যখন
দেখিলাম সব ফাঁকা
কেহ কোথা নাই পিতা মাতা ভাই
কেবল রয়েছি একা।
স্বপ্নে হল সঙ্গ স্বপ্নে সঙ্গ ভঙ্গ
স্বপ্নে দারা পুত্র স্নেহ।
স্বপ্ন জাগরণে মায়া অবসানে
ঘুচিল মোহ দুর্ম্মোহ।

স্বপ্নে দেখিতেছি—সাপ তাড়া করেছে, উর্দ্ধশ্বাসে দৌড়াচ্চি, বাপরে মারে বলে চেঁচাচ্ছি, বুক ধড়্ ধড়্ করছে, মুখ শুকিয়ে গেছে, গলা কাঠ হয়ে গেছে, মুখে রা বেরুচ্ছে না, ভয়ে প্রাণ যায় যায় হয়েছে ; এমন সময়ে ঘুম ভেঙে গেল কোথায় সাপ ? কোথায় দৌড় ? আমি ত বিছানায় শুয়ে। তা হলে দেখ স্বপ্নে সর্প দর্শন মিথ্যা অলীক, ক্ষণভঙ্গুর। যতক্ষণ স্বপ্ন, ততক্ষণ সাপ। স্বপ্ন ভেঙ্গে গেলে আর সাপ নাই। দুনিয়ার সব কি ঠিক এই রকম ক্ষণভঙ্গুর নয় ? এই শিশুটি মধুমাখা বুলিতে জগত মুগ্ধ করচে ; পর দিন সে আর নাই ; এই বাপ মার কাছে কত আদর যত্ন, পর দিন আর তাঁরা নাই ; আজ যুবতী স্বামীর সহিত প্রেম-তরঙ্গে ভাসিতেছে, কাল বিধবাবেশে বুক ফাটা রবে বুকের জ্বালা চারিদিকে ছড়াইতেছে। কাজেই বলতে হয় দুনিয়াটা একটা স্বপ্নবৎ অলীক বস্তু। তাই শঙ্কর বলেছেন,—

স্বষ্টির্নাস্তি জগন্নাস্তি জীবো নাস্তি তথেশ্বরঃ।
মায়য়া দৃশ্যতে সর্ব্বং ভাষ্যতে ব্রহ্ম সত্ত্বয়া॥

সুতরাং ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য বস্তু অলীক, ইন্দ্রিয় ও মন অলীক, ইন্দ্রিয় ও মন রচিত সমস্ত দৃশ্যটাই অলীক, ক্ষণভঙ্গুর ও মিথ্যা। এইটা বুঝে উহাদের অভাব বোধ ফুটিয়ে তুলতে হবে। ও গুলি অনিত্য হবার দরুণ অসৎ বুঝে তৎরহিত হয়ে যাওয়া চাই। এবং যে বুদ্ধিবৃত্তি দ্বারা ঐ সকলের অভাব জ্ঞান ঘটে, সেই বুদ্ধি বৃত্তিকেও শেষকালে ত্যাগ করতে হয়। সেই বুদ্ধি বৃত্তি রহিত হয়ে যাবার পর দ্রষ্টার যে কেবল চিন্ময় স্বরূপ পড়ে রইল—অর্থাৎ দৃশ্য মাত্র অভাব জ্ঞান হবার পর চিন্তনকারী যে দ্রষ্টা শেষ পর্য্যন্ত রয়ে গেল—উহাতে স্থির হওয়াই অচিন্ত্য ব্রহ্মের উপাসনা। এই উপাসনা রূপ সাধন দ্বারা দৃশ্য দর্শনের বাধ ঘটে। এবং দ্রষ্টার পরব্রহ্ম পরমাত্মার সহিত 'তাদাত্ম্য' হয়ে যায়। ইহারই নাম পরমাত্মা প্রাপ্তি ; ইহারই নাম ভগবৎপ্রাপ্তি। যেমন ঘটাকাশ ও মহাকাশের মধ্যে ব্যবধানরূপ কেবল ঘটের আকৃতিই ভেদ দর্শনের হেতু, সেইরূপ জড় দৃশ্যমাত্র জীবাত্মা ও পরমাত্মার ভেদ দর্শনের হেতু। যখন যথার্থ জ্ঞানের দ্বারা সম্পূর্ণ দৃশ্য ও দর্শনের বাধ ঘটে, তখন স্বভাবতঃই জীবাত্মা পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হয়। যেমন ঘট ভেঙে যাবার পর ঘটাকাশ (স্থানীয় আকাশ) মহাকাশের সহিত এক হ'য়ে যায়, সেইরূপ জড় দৃশ্য দর্শন অনিত্য

জ্ঞান পাকা হলে (দেহ-মন-বুদ্ধি ভেঙে গেলে) জীবাত্মা সচ্চিদানন্দ ঘন পরমাত্মার সহিত একী ভাব হয়ে যায় অর্থাৎ অভেদরূপে ব্রহ্মপ্রাপ্তি ঘটে।

২। **চরাচররূপ ব্রহ্মের উপাসনা** ঃ—ব্রহ্মই পিতা মাতা রূপে আসিয়া আমার ভক্তিবৃত্তি চরিতার্থ করিতেছেন ; ব্রহ্মই পত্নীরূপে আসিয়া আমার প্রণয় বৃত্তি চরিতার্থ করিতেছেন ; ব্রহ্মই সন্তানসন্ততিরূপে আসিয়া আমার স্নেহ বৃত্তি চরিতার্থ করিবার অবকাশ দিতেছেন ; ব্রহ্মই ঝি চাকর দাস দাসীরূপে আসিয়া আমার সেবা লইবার প্রবৃত্তি সফল করিতেছেন ; ব্রহ্মই আত্মীয় স্বজনরূপে আসিয়া আমার সহানুভূতি বৃত্তি মিটাইবার ব্যবস্থা করিতেছেন ; ব্রহ্মই শত্রুরূপে আসিয়া আমার কাম-ক্রোধাদি বৃত্তি কতখানি দমন করিতে সমর্থ হইয়াছি তাহার পরীক্ষা লইতেছেন ; ব্রহ্মই শস্যরূপে আসিয়া আমার আহার যোগাইতেছেন ; ব্রহ্মই সুমিষ্ট ফলরূপে আসিয়া আমার আস্বাদ সুখ মিটাইতেছেন ; ব্রহ্মই উচ্ছে করলাদি তিক্ত ফলরূপে আসিয়া আমার ব্যাধির বীজ হরণ করিতেছেন ; ব্রহ্মই গো-মহিষাদি পশুরূপে আসিয়া আমার উপকার সাধন করিতেছেন ; ব্রহ্মই স্থাবররূপে, ব্রহ্মই জঙ্গমরূপে ; ব্রহ্মই চন্দ্র সূর্য্যরূপে কিরণ দিতেছেন ; জগতে যা কিছু চর-অচর, জড়-চেতন দেখতে পাওয়া যায়; সে সব ব্রহ্ম হ'তে উৎপন্ন, ব্রহ্মতেই অবস্থিত, এবং ব্রহ্মেই লীন হয়। সেইজন্য বস্তুতঃ তারা ব্রহ্ম স্বরূপ। যে পুরুষ এই সম্পূর্ণ সংসারকে ব্রহ্মের স্বরূপ বুঝে ব্রহ্মভাবে ইহার উপাসনা করে, সেই ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয়। এই উপাসনা ভেদ ও অভেদ উভয় দৃষ্টিতে করা যেতে পারে। ভেদ দৃষ্টিসম্পন্ন সাধক এই বুঝে যে, যা কিছু দুনিয়ায় আছে, তারা সব ব্রহ্ম, আমি তাদের সেবক মাত্র। অভেদ দৃষ্টি সম্পন্ন সাধক সারা সংসারকে এবং নিজেকেও ব্রহ্মের স্বরূপ বলে বিশ্বাস করে। শ্রীমদ্ ভগবদ্ গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাই বলেছেন —বহিরন্তশ্চ ভূতানামচরং চরমেব চ। অঃ ১৩।১৫॥ পরমাত্মা ব্রহ্মই চরাচর সব ভূতের অন্তর-বাহ্য পরিপূর্ণ করিয়া আছেন এবং চর-অচররূপে তিনিই।

যদা ভূত পৃথগ্ ভাবমেকস্থ মনু-পশ্যতি
তত এব চ বিস্তারং ব্রহ্ম সম্পদ্যতে তদা। গীঃ ১৩।৩০

যে মুহূর্ত্তে সাধক ভূত সকলের পৃথক পৃথক্ ভাবকে এক পরমাত্মায় স্থিত এবং সেই পরমাত্মা হইতেই সম্পূর্ণ ভূত সকলের বিস্তার দেখ্‌তে পায়, অনুভব

করে, সেই মুহূর্ত্তেই সে সচ্চিদানন্দময় ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয়। এটা অনুভবে ফুটিয়ে তুলতে হবে, উপলব্ধির ভিতর দিয়ে দেখতে হবে। দৃশ্য মাত্রই ব্রহ্মের স্বরূপ, পরমাত্মার প্রকট মূর্ত্তি—এই বোধে উপাসনা করতে হবে। এই প্রকারে এই সম্পূর্ণ দৃশ্যমাত্রকে পরমাত্মার স্বরূপ মনে ক'রে উহাদের উপাসনা করতে করতে সাধকের সর্ব্বত্র সমবুদ্ধি হয়ে যায়; কাজেই সে রাগ দ্বেষ রহিত হ'য়ে পড়ে; ফলে পরব্রহ্ম লাভ করে; ভগবৎপ্রাপ্তি ঘটে।

৩। সঙ্কল্প ব্রহ্মের উপাসনাঃ—যত গণ্ডগোল এই মনকে নিয়ে; মন স্থির হয় না বলে। উপাসনায় বস্‌লাম, মন ইষ্ট দেবতার ভাবনা ছেড়ে দিয়ে আয়ের পন্থা ভাব্‌তে বস্‌ল, বা পুত্র কন্যার বিষয় ভাব্‌তে আরম্ভ কর্‌ল। যদি সেখান থেকে ধরে আন্‌লুম, একটু বাদেই বিষয় চিন্তায় লেগে গেছে—মুখে 'শিবায় নমঃ বল্‌ছি মন কিন্তু আলু ক্ষেতে জল দিবার বিষয় ভাব্‌চে, নয় ত মেয়েটা ১৮ বছরে পড়্‌ল, ম্যাট্রিক পাশ করেছে, একটা ভাল পাত্র কোথা পাই, ৭০০০৲ টাকার কম ত ভাল পাত্র পাওয়া যায় না, এত টাকাই বা পাই কোথা? এইরূপে মন বিষয় হ'তে বিষয়ান্তরে কেবল ছুটাছুটি করে, কিছুতেই স্থির হতে চায় না, তরঙ্গের পর তরঙ্গ তুল্‌ছে, সঙ্কল্পের পর সঙ্কল্প গজাচ্চে। উপাসনা আর বুঝি হয় না! শান্তি বুঝি আর পেলাম না! এমন সময় সাধক বেদমুখে শুন্‌তে পায় "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম"। আবার প্রাণে আশা জাগে, অন্ধকারের মধ্যে আলো দেখা দেয়, নিবিড় বিপিনে পথ পায়, ভাঙা হৃদয়ে আবার বল সঞ্চার হয়, সাধক তখন নব উৎসাহে বুক বাঁধে। সাধক ভাবে—সর্ব্বং ব্রহ্ম, কিছু বাদ যাবে না, সর্ব্বং ব্রহ্ম; 'সর্ব্বং' এর মধ্যে মনের সঙ্কল্পগুলিও ত পড়ে; তা' হ'লে তারাও ত ব্রহ্ম; আর যায় কোথা? আনন্দে আশায় উৎফুল্ল হ'য়ে সাধক লাফিয়ে উঠে। মন যত সঙ্কল্প তোলে তুলুক, প্রত্যেক সঙ্কল্পটি হচ্ছে ব্রহ্ম; ভাল সঙ্কল্পই হ'ক, বা মন্দ সঙ্কল্পই হ'ক, সেগুলি সবই ব্রহ্ম; সঙ্কল্পমাত্রেই ব্রহ্ম বোধে উপাস্য। মন যে সঙ্কল্পই করুক, তাকেই ব্রহ্মবোধে উপাসনা কর্‌ব। মনের মধ্যে যে সঙ্কল্প উঠে, তাকেই ব্রহ্ম মনে ক'রে যে উপাসনা করে, তার পক্ষে কোন সঙ্কল্পই বিঘ্নকারক হয় না; বরং সমবুদ্ধি হওয়ায় অনুকূলও প্রতিকূল সঙ্কল্পে রাগ-দ্বেষ জন্মায় না। সঙ্কল্প মাত্রেই ব্রহ্মাকার বৃত্তি জন্মাবার দরুণ সাধকের বিজ্ঞানানন্দঘন ব্রহ্মপ্রাপ্তি ঘটে।

৪। **শব্দ ব্রহ্মের উপাসনা**ঃ—শব্দ উপাসনার বিঘ্ন সৃষ্টি করে। তোড় জোড় করিয়া উপাসনায় বসিলাম; এমন সময় আদি রসের কথাবার্ত্তা কাণে পশিল; ইষ্ট দেবতার চিন্তা ছাড়িয়া মন আগ্রহের সহিত প্রেমের মধুর আলাপ শুনিতে লাগিল; অথবা উগ্র চিৎকার বা করুণ আর্ত্তনাদ শুনিয়া মন চঞ্চল হইয়া উঠিল; উপাসনা আর হইল না, বিঘ্ন ঘটিল। এ বিঘ্ন নিবারণের উপায় কি? সাধক চিন্তিত হইয়া উঠিল। ভগবন্! এ কি বিড়ম্বনা! নিরিবিলি ব'সে তোমায় একটু ডাক্‌ব, তোমার চরণে আবেদন নিবেদন জানাব, তোমার চরণ চিন্তা কর্‌ব তাতে এত বিঘ্ন! এত বাধা!! পাছে কেউ বিরক্ত ক'রে বলে ঘরে খিল দিয়ে তোমার চিন্তায় মস্‌গুল ছিলাম। কোথা হ'তে এই উগ্র চিৎকার দেওয়াল ভেদ করিয়া মন্দিরে পশিয়া মন চঞ্চল করিল? কোথা হ'তে ঐ করুণ আর্ত্তনাদ আসিয়া আমার হৃদয় কপাটে ঘা দিল, একাগ্রতা নষ্ট করিল; মন করুণায় ভরিয়া উঠিল; ইষ্ট দেবতা ভুলিয়া গেলাম। এত বিঘ্ন কেন ঠাকুর! এত বাধা কেন দয়াময়!! বিঘ্নদূর ক'রে দাও ঠাকুর। আমি যে তোমার চরণ ছাড়া আর কিছু জানি না, না। এস, এস করুণাময়, আমার হৃদয় তোমার চিন্তায় পূর্ণ থাক্‌তে দাও ঠাকুর।

এ কি ঠাকুর? এ কি বলছ? শব্দরূপে তুমি! যে কোন শব্দ হ'ক, সে শব্দরূপে তুমি!! আমার রাগ-দ্বেষের পরীক্ষা লইতেছ? অনুকূল শব্দ-শ্রবণে অনুরাগ জাগে কি না, প্রতিকূল শব্দে দ্বেষ উৎপন্ন হয় কি না তাই ঠাকুর দেখ্‌ছ! 'সর্ব্বই' যখন তুমি, সত্যই ত ঠাকুর, শব্দটাও ত তুমিই বটে। আমি কি মূর্খ!!! শুধু মুখেই বলি, 'ত্বমেব সর্ব্বং মম দেবদেব।' শব্দ মাত্রেই তুমি; সুমিষ্ট স্বরই হ'ক, আর কর্কশ শব্দই হ'ক, সে সবই তুমি। তখন সাধকের কু সু সকল শব্দেই সমবুদ্ধি জন্মায়। তখন সাধক সকল শব্দকে ব্রহ্মবোধে উপাসনা করে। ব্রহ্ম সম এবং এক। এইজন্য সাধকের শব্দ মাত্রেই সমবুদ্ধি হয়ে যায়। কাজেই সে অনুকূল প্রতিকূল শব্দে রাগ-দ্বেষ রহিত হয়ে পড়ে, হর্ষ শোক রহিত হয়ে যায়। কেউ উহার স্তুতি বা নিন্দা করলেও তাহাতে উহার চিত্তে কোন বিকার দেখা দেয় না। শব্দ মাত্রেই ব্রহ্ম বলিয়া স্বীকার করায় সব সময়ই উহার বৃত্তি ব্রহ্মাকার ধারণ ক'রে থাকে। ফলে উহার অন্তঃকরণ শুদ্ধ থাকে এবং পরম শান্তি ও পরমানন্দ প্রাপ্ত হয়।

৫। **নিঃস্বার্থ কর্ম্ম সাধন** ঃ—স্বার্থ=স্ব+অর্থ। স্বার্থ মানে নিজের জন্য, নিজের ব্যক্তিগত লাভের জন্য ; নিঃস্বার্থ শব্দের অর্থ 'আপনার জন্য নয়, পরের মঙ্গলের জন্য। সাধারণ লোক স্বার্থের জন্য কাজ ক'রে থাকে ; নিজের কি লাভ হবে—আগে ভাবে ; যদি নিজের লাভ হবে নিশ্চিত বোঝে, তবে সে কাজে হাত দেয়, তবে সে কাজে এগোয়, নচেৎ নহে। যজ্ঞ, দান, তপ, সেবা, তীর্থ, ব্রত, উপবাস, কৃষি, বাণিজ্য, খাওয়া, পরা, শৌচ-স্নান, লেন-দেন আদি যা কিছু কর্ম্ম সাধারণ লোক করে, কিছু-না কিছু ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্য ক'রে থাকে। ব্যবসায়ী দোকান খোলা থেকে বন্ধ করা পর্য্যন্ত যা কিছু ক্রয়-বিক্রয়, লেন-দেন করে, তার প্রত্যেক কাজে লক্ষ্য থাকে কিসে তার বেশী টাকা লাভ হয়। নিজের কোলের ঝোল-ভাতটার দিকে সকলের লক্ষ্য। যাতে সামান্য ক্ষতির সম্ভাবনা আছে, সে কাজে সে কখনও এগোয় না, জেনে শুনে কে আর আগুণে হাত দেয়? সেই রকম যজ্ঞ, দান, তপস্যা-কারী সকামী লোক ধন-দৌলত বিষয় বৈভব স্ত্রীপুত্রাদি ইহলৌকিক ও স্বর্গাদি পারলৌকিক ভোগ কামনায় ঐ সকল কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়। হয় ইহলোকে মঙ্গল হবে, নয় পরলোকে মঙ্গল হবে—এই স্বার্থ প্রণোদিত হয়েই সাধারণ লোক ধর্ম্ম কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়। যে কাজে ইহলোকে বা পরলোকে কিছুমাত্র স্বার্থ সিদ্ধির আশা নাই, সে কাজে সে কখন পা দেয় না, সে দিকে মাড়ায় না, সে দিক দিয়ে যায় না।

ছোট বড় সব কাজেই প্রবৃত্ত হবার পূর্ব্বে মানুষ এই চিন্তা করে যে, 'এ কাজে তার কি লাভ হবে?' একটা লাভের আশা পেলে তবে সে কাজে প্রবৃত্ত হয়। বিনা প্রয়োজনে, বিনা স্বার্থে, সে এক পা এগুতে চায় না ; পদে পদে তার মনে স্বার্থ চিন্তা। মন তার স্বার্থ চিন্তায় ভরা। এই স্বার্থ চিন্তা হেতু মানুষকে বার বার দুঃখ পূর্ণ সংসার চক্রে ঘুরে মরতে হয় ; বার বার জন্ম মৃত্যু ভোগ করতে হয় ; যাতায়াত তার আর ঘোচে না, ঘটী-যন্ত্রবৎ উঠা-নামার আর অন্ত নাই। যে যথার্থ কল্যাণ চায়, তার স্বার্থ রহিত হওয়া চাই, স্বার্থ রহিত হয়ে লোকহিতে রত হওয়া চাই, লোক হিতকর কর্ম্মে রত থাকা চাই। যেমন স্বার্থপর মানুষ কোন কাজ আরম্ভ করবার পূর্ব্বে সে কাজে তার কি লাভ হবে চিন্তা করে, সেইরূপ প্রত্যেক কাজের

প্রারম্ভে নিঃস্বার্থ পুরুষের মনে এই ভাব জাগা চাই যে এ কাজের দ্বারা অন্যের কি হিত হবে। যে কর্ম্মের আরম্ভে সংসারের কল্যাণ চিন্তা ক'রে প্রবৃত্ত হওয়া যায়, সেই কর্ম্মকেই নিষ্কাম কর্ম্ম বলে। পরের মঙ্গল চিন্তা সম্বল ক'রে যে কাজে নামা যায়, তাকেই নিষ্কাম কর্ম্ম বলে। অনেক সজ্জন লোকোপকার বাবতে ধন-সম্পত্তি ও শরীরের আরাম ত্যাগ করে থাকেন। পরের উপকার হ'ক এই মানসে অনেকে অনেক অর্থ খরচ ক'রে থাকেন। এটা অবশ্য বেশ ভাল কথা। কিন্তু যিনি ঐ সকলের বদলে মান-বড়াই প্রতিষ্ঠা পেতে চান, তাঁর সে ত্যাগ নিঃস্বার্থ নয়। মান-বড়াই প্রতিষ্ঠাকামী হ'য়ে শুভকর্ম্ম করা না করার চেয়ে অনেক ভাল; সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু বাস্তবিক কল্যাণের পথে এই কামনা বাধা সৃষ্টি করে। আর যদি সে কাজ ক'রতে গিয়ে রাগ দ্বেষের বশে গিয়ে পড়ে, তবে তো সে কামনা দ্বারা পতন অবশ্যম্ভাবী। অনুকূল বিষয়ে অনুরাগ ও প্রতিকুল বিষয়ে দ্বেষ দেখা দিলে সমদৃষ্টি বজায় থাকে না, দৃষ্টি কলুষিত হয়; ফলে অধোগমন অনিবার্য্য হ'য়ে পড়ে। সুতরাং যিনি বাস্তবিক মঙ্গল চান, সত্য সত্যই কল্যাণ চান, তাঁর পক্ষে লোকহিত কর কর্ম্ম করা চাই স্বার্থের দিকে দৃষ্টি না রেখে; মান-বড়াই-প্রতিষ্ঠার ইচ্ছা ত্যাগ করা চাই, বিশুদ্ধ নিঃস্বার্থ ভাবে লোকহিতার্থে কর্ম্ম করা চাই।

কোন কোন সাধক মান-বড়াই-প্রতিষ্ঠা ও স্বর্গের ইচ্ছাও ত্যাগ ক'রে কেবল আপন আত্মার উদ্ধারের ইচ্ছায় প্রণোদিত হয়ে যজ্ঞ, দান, তপ, সেবা, সৎসঙ্গ ও ব্যাপারাদি শাস্ত্রবিহিত কর্ম্ম ক'রে থাকেন। যদিও এরকম কর্ম্মী উপরিউক্ত সকল সাধক হ'তে শ্রেষ্ঠ, তথাপি কেবলমাত্র আপন আত্মার উদ্ধার ইচ্ছাই মুক্তিরূপ স্বার্থ-বুদ্ধির কারণ কখন কখন মোহে ফেলে সাধককে কর্ত্তব্যচ্যুত ক'রে দেয়। কোন কোন ক্ষেত্রে ইহা রাগ-দ্বেষের উৎপন্ন ক'রে সাধকের পতন ঘটায়। এইজন্য কেবলমাত্র আপন উদ্ধার ইচ্ছা না রেখে সকল প্রাণীর কল্যাণ-উদ্দেশ্যে মানুষের শাস্ত্রবিহিত কর্ম্মে প্রবৃত্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়। এই প্রকার নিঃস্বার্থ ভাবে শুভকর্ম্ম নিরত মানুষের সহজেই পরমাত্মাপ্রাপ্তি ঘটে।

নিম্নলিখিত উদাহরণ দৃষ্টে ইহা সহজবোধ্য হইবে :—

কলিকাতার উপকণ্ঠে বারাসাত মহকুমার অন্তর্বর্ত্তী হরিহরপুর গ্রামে রামশঙ্কর বিদ্যাবাচস্পতি নামে এক জ্ঞানী ভক্ত বাস করিতেন। তিনি সকলের কল্যাণকামী ছিলেন, পরহিতে রত থাকতেন, এক কথায় জগদ্-হিতৈষী ছিলেন। ইহার ফলে একদিন ভগবান স্বয়ং তাঁর সাম্‌নে এসে বল্‌লেন—"আমি তোমার উপর প্রসন্ন হইয়াছি ; তোমার যা ইচ্ছা, সেই বর চাও।"

রামশঙ্কর—ভগবন্! আমার উপর আপনার অনন্ত কৃপা। তা থেকে বড় আর কি আছে, যা আপনার কাছে চাইব? আপনার কৃপায় আমার কোন বস্তুর অভাব নাই, আবশ্যকও নাই।

ভগবান—আমার সন্তোষের জন্য তোমার অবশ্যই কিছু চাওয়া চাই।

রামশঙ্কর—প্রভো! যদি আপনার এতই আগ্রহ, তবে আমি আপনার কাছে এই চাই যে আমার মনে যদি কখন চাইবার প্রবৃত্তি জাগে, তবে আপনি সর্ব্বদা সেই 'চাওয়া' প্রবৃত্তি বিনাশ করে দিন।

ভগবান—এতে তো তোমার কিছু চাওয়া হ'ল না। আমাকে প্রসন্ন ক'রবার জন্য তোমার অবশ্যই কিছু চাইতে হবে। তোমার যা ইচ্ছা চাইতে পার।

রামশঙ্কর—আপনি যখন আমাকে চাইতে এত বাধ্য করছেন, তখন আমি আপনার কাছে এই চাইছি যে আপনি সংসারের সকল জীবের কল্যাণ করে দিন।

ভগবান—যদি সকল জীবের কল্যাণ করা হয়, তবে তাদের কৃতপাপের ফল কে ভোগ ক'রবে?

রামশঙ্কর—সকলের পাপের ফল আমাকে ভুগ্‌তে দিন।

ভগবান—তুমি ভক্ত হ'য়ে একা সকল জীবের পাপের দণ্ড কেমনে ভোগ ক'রতে সমর্থ হবে?

রামশঙ্কর—তবে আপনি সকলকে ক্ষমা করুন।

ভগবান—তাদের পাপের ফল না ভুগিয়ে ক্ষমা করা অসম্ভব।

রামশঙ্কর—আপনি সর্ব্বশক্তিমান পরমেশ্বর। আপনার পক্ষে কিছুই অসম্ভব নয়।

ভগবান—এরূপ করতে আমি অসমর্থ!

রামশঙ্কর—আপনি আপনাকে 'অসমর্থ' বলছেন; তবে আপনি আমার ইচ্ছানুসারে বর চাইতে এত আগ্রহ দেখাচ্ছেন কেন? স্ত্রী-পুত্র-ধন-মান বড়াই স্বর্গ-মোক্ষ আদি কোন এক বস্তুর চাইবার কথা বলা ভাল ছিল। 'যা ইচ্ছা, সেই বর চাও' বলে কথা দিয়ে যাচকের প্রার্থনা পূর্ণ করা চাই।

ভগবান—ভক্ত! আমার হার, তোমার জিত। আমি ভক্তের কাছে সদাই হেরে যাই।

রামশঙ্কর—হার ত আমারই হল; জিত হ'ত, যদি আপনি সকল জীবের কল্যাণ ক'রে দিতেন।

ভগবান—তোমার এই নিঃস্বার্থ ভাব দেখে আমি অতি প্রসন্ন হয়েছি। আমি তোমাকে এই বর দিচ্ছি, 'যে কেউ তোমার দর্শন ও চিন্তা করবে, তারই কল্যাণ হবে।'

এই প্রকার সংসারের কল্যাণকামী পুরুষের নিঃস্বার্থভাবে লোকহিতার্থ সকল কর্ম্ম করা দরকার।

৬। **সেবা-সাধন** :—সকল প্রাণীর সেবা করা পরম ধর্ম্ম। জীব সেবার জন্য লোকে কত না ত্যাগ স্বীকার করে থাকে। জীব সেবার জন্য দাতা ধন-সম্পত্তি দান করিয়া থাকে, ধর্ম্মশালা, চিকিৎসালয়, বিদ্যালয়, অতিথিশালা আদি প্রতিষ্ঠা করে। ধন-সম্পত্তি, শারীরিক সুখ, ও মান-বড়াই প্রতিষ্ঠার প্রতি বিমুখ, মমতা আসক্তি ও অহংকার রহিত হয়ে মন, বাক্য, দেহ ও ধন দ্বারা সকল প্রাণীর হিতে রত হ'য়ে তারা যাতে সুখে থাকে সেই চেষ্টা করাকে 'সেবা-সাধন' বলে। এইরূপ সাধন দ্বারা সাধকের চিত্ত নির্ম্মল ও প্রসন্ন হয়ে থাকে ও অন্তে ভগবৎপ্রাপ্তি ঘটে।

তিন ভাবে প্রণোদিত হ'য়ে সেবা ধর্ম্ম পালন করা যেতে পারে :—

১। সকলেই ঈশ্বরের সন্তান; সুতরাং সকলকেই আপন বন্ধু বলে মনে করা। ২। আত্ম-দৃষ্টিতে সকলেই 'আমার স্বরূপ' বোধ করা। ৩। এক পরমাত্মাই সকল প্রাণীর হৃদয়ে অবস্থিত। কাজেই সকলকে সাক্ষাৎ 'পরমেশ্বর' বলে মেনে লওয়া।

বন্ধু ভাবে সেবায় একজন অপরের প্রতি পর-বুদ্ধি স্থাপন করায় রাগ-দ্বেষ

বশে কখন কখন ঝগড়া, কলহ বা মনোমালিন্য দেখা দিতে পারে। কিন্তু আত্মভাবে সেবায় তার সম্ভবনা নাই। সুতরাং বন্ধুভাবে সেবা অপেক্ষা আত্মভাবে সেবা উত্তম। আবার আত্মভাবে সেবা অপেক্ষা পরমাত্মভাবে সেবা আরও ভাল। কেননা, মানুষ আপন ইষ্টদেবতার সেবার জন্য আপন প্রাণ হাসি মুখে বলি দিতে পারে। শেষোক্ত ভাবে জনসেবায় শীঘ্র ভগবৎপ্রাপ্তি ঘটা সম্ভব।

উত্তম দেশ, উত্তম কাল ও উত্তম পাত্র পেয়ে ন্যায়ানুকূল সেবা করা খুবই মহত্ত্বপূর্ণ। নবদ্বীপ উত্তম দেশ, সন্দেহ নাই। কিন্তু নবদ্বীপে যদি ফসল ভাল হয়ে থাকে এবং খুলনায় দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়, তা' হ'লে অন্নদানের পক্ষে নবদ্বীপ অপেক্ষা খুলনাই অধিক উপযুক্ত দেশ। সেইরূপ একাদশী, পূর্ণিমা, গ্রহণ, পর্ব্বকাল দানের পক্ষে শ্রেষ্ঠ হ'লেও যখন অন্য সময়ে অন্নের অভাবে প্রাণী মরতে থাকে, তখন পর্ব্বকাল অপেক্ষা পর্ব্বাতিরিক্তকাল অন্নদানের জন্য শ্রেষ্ঠ মনে করতে হবে। পাত্রের বিষয়ও এইরূপ বুঝতে হবে। যে প্রাণী দ্বারা যত অধিক উপকার পাওয়া যায়, সেই প্রাণীই সেবার অধিক উপযুক্ত পাত্র। কৃমি কীট অপেক্ষা পশু, পশুদের মধ্যে গরু, পশু অপেক্ষা মানুষ, মানুষের মধ্যে আবার উত্তম গুণসম্পন্ন ও সদাচারী পুরুষ সেবার পক্ষে বিশেষ উপযুক্ত পাত্র। তৃষ্ণার্ত্তকে জলদান, ক্ষুধার্ত্তকে অন্নদান, উলঙ্গকে বস্ত্রদান, পীড়িতকে ঔষধ দান ও আতুরকে অভয় দান জীব-সেবার প্রধান অঙ্গ। সেবা সাধনে ক্রিয়া অপেক্ষা ভাবের প্রাধান্য বেশী। স্ত্রী পুত্র, ধন-মান, বড়াই প্রতিষ্ঠা স্বর্গাদি প্রাপ্তি উদ্দেশ্যে আজীবন উপরিউক্ত সেবা কার্য্য অপেক্ষা মমতা আসক্তি অহংকার শূন্য হ'য়ে নিঃস্বার্থ ভাবে অল্পমাত্রায় সামান্য সেবাও অধিক মূল্যবান।

—o—

শান্তি আশ্রম, চুঁচুড়া } ১৫ই চৈত্র, ১৩৪৭

পঞ্চভূতের বিচার

দুনিয়ার মেলা পঞ্চভূতের খেলা। ইট পাথরে যেমন অট্টালিকা তৈরী, পঞ্চভূতে তেমনি দুনিয়াটা তৈরী। পঞ্চভূত দিয়েই তুমি আমি গড়া; পঞ্চভূত দিয়েই গাছপালা তৈরী, পঞ্চভূতই যাবতীয় দৃশ্য বস্তুর উপাদান। পঞ্চভূতের স্বরূপ বুঝলে ব্রহ্মের স্বরূপ অনুভূতিতে ফুটে ওঠে। তাই পঞ্চভূতের স্বরূপ জানবার জন্য সাধকেরা এত চেষ্টা ক'রে থাকে, এত যত্ন ক'রে থাকে। পঞ্চভূত কি? তাদের গুণ কি? ধর্ম্ম কি? তাদের স্বরূপ কি? বেশ ভাল ক'রে বুঝতে পার্লে পরমাত্মার জ্ঞান পরিস্ফুট হ'য়ে উঠে; তাই সাধকের পক্ষে পঞ্চভূতের বিচার একান্ত আবশ্যক।

আমি আমি করি, বুঝিতে না পারি,
কে আমি, আমাতে আছে কি রতন?
পঞ্চভূতে আমায় দিয়েছে আকার
দিয়ে নিতে কতক্ষণ?

'আমি'-কে সবাই ভালবাসে; 'আমি'র যেন কখন ধ্বংশ না হয়—এইসবাই চায়। 'আমি' যেন চিরদিন থাকে, 'আমি' যেন চিরসুখে থাকে—এইটাই জীব মাত্রেরই কামনা। এই 'আমি'টা কে? এই আমি কি এই সাড়ে তিন হাত দেহ? না, তা নয়! হাত, পা, কাণ, চোখ নষ্ট হয়ে যেতে পারে, নষ্ট হ'য়ে যাবার পরও 'আমি'টা কিন্তু থাকে। তা' হ'লে বল্তে হয়, হাত, পা, চোখ, কাণ এরা 'আমি' নয়। রস-রক্ত-মাংস-স্নায়ু, অস্থি, মজ্জা, শুক্র দিয়ে হাত-পা-চোখ-কাণ-আদি সম্বলিত এই দেহটা তৈরী। এদের সপ্ত ধাতু বলে। দেহটাও আমি নয়, এই সপ্ত ধাতুর কোনটাই 'আমি' নয়। পঞ্চভূতের পঞ্চীকরণে এই সপ্ত ধাতুর আবির্ভাব, এ দুনিয়ার সৃষ্টি, এই দৃশ্য প্রপঞ্চের উৎপত্তি।

ভূত পাঁচটি বটে; ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম। তারা কিন্তু দু'রকম; সূক্ষ্ম পঞ্চভূত ও স্থূল পঞ্চভূত। তমঃ প্রধান প্রকৃতি হ'তে সূক্ষ্ম পঞ্চভূতের উৎপত্তি। সূক্ষ্ম আকাশের সত্ত্বগুণ হইতে শ্রোত্রেন্দ্রিয়, সূক্ষ্ম বায়ুর সত্ত্বগুণ হইতে ত্বগিন্দ্রিয়, সূক্ষ্ম তেজের সত্ত্বগুণ হইতে চক্ষু। সূক্ষ্ম জলের সত্ত্বগুণ হইতে জিহ্বা, সূক্ষ্ম ক্ষিতির সত্ত্বগুণ হইতে ঘ্রাণেন্দ্রিয় উৎপন্ন হয়।

সমুদায় সূক্ষ্ম পঞ্চভূতের সত্ত্বগুণ সমষ্টি হইতে অন্তঃকরণ উৎপন্ন হয়। অন্তঃকরণের সংশয়াত্মিকা বৃত্তিকে মন বলে এবং নিশ্চয়াত্মিকা বৃত্তিকে বুদ্ধি বলে। সূক্ষ্ম আকাশের রজোগুণ হইতে বাগিন্দ্রিয়, সূক্ষ্ম বায়ুর রজোগুণ হইতে হস্ত-ইন্দ্রিয়, সূক্ষ্ম তেজের রজোগুণ হইতে পদ-ইন্দ্রিয়, সূক্ষ্ম জলের রজোগুণ হইতে উপস্থ-ইন্দ্রিয়, সূক্ষ্ম পৃথ্বীর রজোগুণ হইতে পায়ু-ইন্দ্রিয় উৎপন্ন হয়। সমুদয় সূক্ষ্ম পঞ্চভূতের রজো গুণসমষ্টি হইতে প্রাণ উৎপন্ন হয়। নাসিকাস্থ বায়ুর নাম প্রাণ ; শ্বাস প্রশ্বাস তাহার কার্য্য ; পায়ুস্থ বায়ুর নাম অপান ; মল মুত্রাদি ত্যাগ তাহার কার্য্য ; উদরস্থ দ্রব্যের পরিপাককারী, বায়ুর নাম সমান ; সর্ব্ব শরীর রক্ষা ও সংগ্রহ-চেষ্টাদি ইহার কার্য্য ; কণ্ঠস্থ বায়ুর নাম উদান, সমস্ত শরীরব্যাপী বায়ুর নাম ব্যান। পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, পঞ্চ প্রাণ, মন ও বুদ্ধি এই সপ্তদশ অবয়বের সমষ্টির নাম সূক্ষ্ম শরীর। এই সূক্ষ্ম শরীরের অপর নাম লিঙ্গ শরীর। এখানে একটা কথা সাধক মনে রাখিও যে, লিঙ্গ বা সূক্ষ্ম শরীর সূক্ষ্ম অংশ দ্বারা নির্ম্মিত, অপঞ্চীকৃত পঞ্চভূত দ্বারা গঠিত। এখানে হস্ত মানে গ্রহণ করিবার শক্তি, পদ মানে গমন করিবার শক্তি, চক্ষু মানে দর্শন করিবার শক্তি, কর্ণ অর্থ শুনিবার শক্তি, জিহ্বা মানে আস্বাদন-শক্তি, নাসিকা অর্থ আঘ্রাণ-শক্তি, ত্বগিন্দ্রিয় অর্থ স্পর্শ করিবার শক্তি, ইত্যাদি। তা' হলে সূক্ষ্ম দেহের দর্শন, শ্রবণ, আঘ্রাণ, আস্বাদন, স্পর্শ, গ্রহণ, গমন, কথন, ত্যাগ ও আনন্দ উপভোগের শক্তি আছে। ঈশ্বরের লিঙ্গ দেহ নাই ; কাজেই তাঁর দর্শন, গ্রহণ গমনাদির বালাই নাই। যখন তিনি লিঙ্গ দেহে অভিমান করেন, তখন তিনি একটু নামিয়া পড়িলেন ; তখন তাঁর নাম হইল হিরণ্যগর্ভ ; হিরণ্যগর্ভের দর্শন, শ্রবণ, আঘ্রাণ, আস্বাদন, স্পর্শ, গ্রহণ, গমন, কথন, ত্যাগ ও আনন্দ উপভোগের শক্তি আছে। ঈশ্বরের লিঙ্গদেহে অভিমান না থাকায় এ-সব গুলি নাই। তিনি মাত্র মায়োপহিত চৈতন্য—শুদ্ধ সত্ত্বগুণ প্রকৃতির ক্ষীণ আবরণে আবৃত .ব্রহ্ম মাত্র। ইহাই ঈশ্বরের ধারণা (শ্রুতি অনুযায়ী)। ব্রহ্মের উপর ক্ষীণ আবরণ পড়িলে তাঁর নাম হয় ঈশ্বর। সেই আবরণ আর একটু ঘনীভূত হ'লে, তখন তাঁর নাম হয় হিরণ্যগর্ভ। সাধক এখানে মনে রাখিও "ব্রহ্মের উপর আবরণ পড়া" ইত্যাদি বাক্য প্রয়োগ দ্বারা ঈশ্বরের ধারণা প্রকাশের ক্ষীণ প্রয়াস

মাত্র ; সত্যই কিছু আবরণ পড়ে না ; ও সকল অনুভূতির রাজ্য ; অনুভূতির ব্যাপার পূর্ণরূপে বাক্য দ্বারা প্রকাশ করা যায় না। এইখানে সাধকেরা নিম্নলিখিত শ্রুতি-বাক্য উপলব্ধি করিতে চেষ্টা করিবে :—ভগবানের হাত পা নাই অথচ তাঁর গ্রহণ ও গমনের শক্তি আছে, চক্ষু নাই অথচ দেখবার শক্তি আছে, সব দেখতে পান, কান নাই অথচ সব শুনতে পান।

অপানিপাদো জবনো গ্রহীতা
পশ্যত্যচক্ষুঃ সঃ শৃণোত্যকর্ণঃ।
স বেত্তি বেদ্যং ন চ তস্যাস্তি বেত্তা
তমাহুরগ্র্যং পুরুষং মহান্তম্।

এখন স্থূল শরীর কেমন ক'রে উৎপন্ন হয় দেখা যাক। যে সূক্ষ্ম পঞ্চভূতের কথা পূর্ব্বে উল্লেখ করা হয়েছে, তা' দিয়ে স্থূলদেহ উৎপন্ন হয় না। তাই ভগবান সূক্ষ্ম পঞ্চ মহাভূতকে পঞ্চীকরণ করিলেন ; স্থূল শরীরের উপাদান তৈরী করিলেন। জীবের ভোগের জন্য ইহা দরকার। তাদের ভোগ্য অন্নপানাদির উৎপত্তির জন্য পঞ্চ স্থূলভূতের প্রয়োজন। এবং তাদের ভোগের স্থানের জন্য (জরায়ুজ, অণ্ডজ, উদ্ভিজ্জ, স্বেদজ শরীর উৎপত্তির জন্য) স্থূল পঞ্চভূতের প্রয়োজন।

তদ্ ভোগায় পুনর্ভোগ্য-ভোগায়তন-জন্মনে
পঞ্চীকরোতি ভগবান্ প্রত্যেকং বিয়দাদিকম্।
দ্বিধা বিধায় চৈকৈকং চতুর্দ্ধা প্রথমং পুনঃ
স্বস্বেতর দ্বিতীয়াংশৈ যোজনাৎ পঞ্চ পঞ্চ তে। ইতি পঞ্চদশী।

আকাশাদি প্রত্যেক সূক্ষ্ম পঞ্চভূতকে প্রথমতঃ দুই দুই অংশে বিভক্ত করিয়া পশ্চাৎ সেই দুই দুই অংশের এক এক অংশকে চারি চারি খণ্ড করিয়া স্বীয় স্বীয় অর্দ্ধ অংশ পরিত্যাগপূর্ব্বক অন্য চারি ভূতের প্রথমোক্ত অর্দ্ধ অর্দ্ধ অংশে সেই চারি অংশের এক এক অংশ যোগ করিলে সকল ভূত প্রত্যেকেই পঞ্চ পঞ্চ হইল। এইরূপ মিশ্রণের নাম পঞ্চীকরণ। বুঝিবার সুবিধার জন্য নিম্নে পঞ্চীকরণের তালিকা দেওয়া হইল।

পঞ্চীকরণ তালিকা

সূক্ষ্ম পঞ্চমহাভূত	সূক্ষ্ম-আকাশ		সূক্ষ্ম-বায়ু		সূক্ষ্ম-তেজ		সূক্ষ্ম-জল		সূক্ষ্ম-ক্ষিতি		মোট
স্থূল আকাশ	॥০	+	৵০	+	৵০	+	৵০	+	৵০	=	১৲
স্থূল বায়ু	৵০	+	॥০	+	৵০	+	৵০	+	৵০	=	১৲
স্থূল তেজ	৵০	+	৵০	+	॥০	+	৵০	+	৵০	=	১৲
স্থূল জল	৵০	+	৵০	+	৵০	+	॥০	+	৵০	=	১৲
স্থূল পৃথিবী	৵০	+	৵০	+	৵০	+	৵০	+	॥০	=	১৲

এইরূপে পঞ্চ স্থূল ভূত উৎপন্ন হইল। এই পঞ্চীকৃত পঞ্চ স্থূল ভূত হইতে বিশ্ব, ব্রহ্মাণ্ড উৎপন্ন হইয়াছে। পঞ্চ স্থূল ভূত হইতে এই ব্রহ্মাণ্ডে চতুর্দ্দশ ভুবন (ভূলোক, ভূবর্লোক, স্বর্লোক, মহলোক, জনলোক, তপলোক, সত্য লোক এই সপ্তলোক এবং তল, অতল, বিতল, নিতল, তলাতল, মহাতল, সুতল, এই সপ্ত পাতাল) সৃষ্ট হইয়াছে। আর এই চৌদ্দ ভুবনে ভোগ্য পদার্থ সকল ও তত্তদ্ ভোগের উপযুক্ত শরীর সকলও স্থূল ভূত হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। এই যে ব্রহ্মাণ্ড চতুর্দ্দশ ভুবন, ভোগ্য পদার্থ ও ভোগের উপযুক্ত শরীর সকল—এই গুলিতে যখন হিরণ্যগর্ভ অভিমান করেন, অর্থাৎ ব্রহ্মাণ্ডই আমার শরীর এইরূপ জ্ঞান করেন, তখন তাঁর নাম হয় বৈশ্বানর বা "বিরাট"। বিরাট পুরুষ সমস্ত স্থূল শরীরের সমষ্টিতে অভিমানী। আর ব্যষ্টিতে তদ্ অভিমানীকে দেব, মনুষ্য, গো, অশ্ব প্রভৃতি রূপ "বিশ্ব" বলা হয়। স্থূল দেহাভিমানী ব্যষ্টি তৈজস গুলিকেই বিশ্ব শব্দবাচ্য জীব বলে। অনাত্মদর্শী তত্ত্বজ্ঞানবর্জ্জিত সেই দেব মনুষ্য প্রভৃতি বিশ্ব শব্দ বাচ্য জীব সকল সাংসারিক সুখ দুঃখ ভোগের জন্য সদসৎ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়; এবং পুনর্ব্বার কর্ম্মানুষ্ঠান করিবার জন্য তৎফল সুখ দুঃখাদি ভোগ করে। এই প্রকারে জন্ম-মরণরূপ সংসারে পুনঃ পুনঃ আবর্ত্তিত হইতে থাকে; যেমন নদীর আবর্ত্তে পতিত কীট এক আবর্ত্ত হইতে অন্য আবর্ত্তে পতিত হয়, কোন প্রকারে উত্তীর্ণ হইয়া সুখ লাভ করিতে সমর্থ হয় না, তদ্রূপ বিশ্ব শব্দ বাচ্য জীবগুলি (দেবতারাও বাদ নহেন) কোনরূপেই নিরতিশয় সুখ লাভ করিতে সমর্থ হয় না। তাই শ্রুতি বলিতেছেন,—

নদ্যাং কীটা ইবাবর্ত্তাদাবর্ত্তান্তর-মাশু তে
ব্রজন্তো জন্মনো জন্ম লভন্তে নৈব নির্ব্বৃতিম্।

কোন খরস্রোতা নদী, তার আবর্ত্তে যদি কোন কীট আসিয়া পড়ে, তাহা হইলে সেই কীট আবর্ত্ত হইতে আবর্ত্তান্তরে ঘুরিয়া মরে; যদি তাহার কোন পূর্ব্ব জন্মের সুকৃতি থাকে, যাহার ফলে কোন দয়ালু মহাশয় তাহাকে আবর্ত্ত হইতে উঠাইয়া তীরস্থ বৃক্ষ ছায়ায় স্থাপন করেন, তবেই সেই কীট সুখ ভোগে সমর্থ হয়; এ সংসারেও তদ্রূপ অনাত্মদর্শী দেব মনুষ্য প্রভৃতি প্রাজ্ঞ জীব ভীষণ দুঃখদায়ক সংসার-আবর্ত্তে পড়িয়া জন্ম-জন্মান্তর ধরিয়া ক্রমাগত দুঃখ ভোগ করিতে থাকে; তবে তাহার যদি কোন পূর্ব্বজন্ম সঞ্চিত পুণ্য থাকে, তাহা হইলে সেই পুণ্য ফলে সে কোন আত্মদর্শী গুরুর উপদেশ পাইয়া পঞ্চ ভূত ও পঞ্চ কোষের স্বরূপ জানিয়া আত্মাকে সে সকল হইতে পৃথক বুঝিয়া সংসারার্ণব হইতে পরিত্রাণ পাইয়া মুক্তির আস্বাদ পাইয়া থাকে।

আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল, পৃথিবী—এই পাঁচটিকে স্থূল ভূত বলে। আকাশের কেবল শব্দমাত্র গুণ; তাই আকাশকে শব্দবাহী বলে। বায়ুর গুণ দুটা শব্দ ও স্পর্শ; বায়ুর স্পর্শ অনুষ্ণ ও অশীতল, গরমও নয়, ঠাণ্ডাও নয়। অগ্নির গুণ তিনটি; শব্দ, স্পর্শ ও রূপ; আগুণ যখন দাউ দাউ জ্বলে, তখন 'ভুগু ভুগু' শব্দ হ'তে থাকে; ইহার উষ্ণতা, স্পর্শ ও প্রকাশ রূপ। জলের গুণ চারিটি: শব্দ, স্পর্শ, রূপ ও রস। জল নাড়িলে চাড়িলে বা প্রবাহিত হইতে থাকিলে 'চুলু চুলু' শব্দ হ'তে থাকে। ইহার স্পর্শ শীতল, শুক্লরূপ ও মাধুর্য্য রস। পৃথিবীর পাঁচটি গুণ; শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ। পৃথিবী বা পাথর পরস্পর ঠোকাঠুকি হইলে "কড় কড়" শব্দ হয়, ইহার স্পর্শ কঠিন, বিচিত্র রূপ, মধুরাদি রস, সদ্ গন্ধ ও দুর্গন্ধ উভয়ই বর্ত্তমান।

জীবের পাঁচটি সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয় আছে; শ্রোত্র, ত্বক্, চক্ষুঃ, জিহ্বা, ঘ্রাণ—ইহারাই তাদের নাম। ইহাদিগকে জ্ঞানেন্দ্রিয় বলে। ইহারা পঞ্চভূতের সত্ত্বগুণ হইতে জাত। ইহারা অতি সূক্ষ্ম, সেই জন্য অপ্রত্যক্ষ; জীবদেহের নির্দ্দিষ্ট স্থানে ইহারা সন্নিবেশিত; কর্ণে শ্রোত্র অবস্থিত, ত্বক্ দেহাবরণে, চক্ষুঃ বা দর্শন শক্তি নয়নে, জিহ্বা বা আস্বাদন শক্তি জিহ্বায় ও আঘ্রাণ শক্তি নাসিকায় সন্নিবিষ্ট। পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়কে শ্রোত্রাদি না বলিয়া শ্রবণ শক্তি,

স্পর্শ-শক্তি, দর্শন-শক্তি, আস্বাদন-শক্তি ও ঘ্রাণ-শক্তি বলাই ভাল; কারণ, তারা অতি সূক্ষ্ম শ্রবণ-শক্তি কর্ণে বাস করে এবং শব্দ গ্রহণ করে; শব্দই শ্রবণেন্দ্রিয়ের বিচরণ ভূমি; দর্শন-শক্তি চক্ষুতে বাস করে, এবং রূপ গ্রহণ করে; রূপ দর্শনেন্দ্রিয়ের বিচরণ ভূমি; আস্বাদন-শক্তি জিহ্বায় বাস করে এবং রস গ্রহণ করে; রস রসনেন্দ্রিয়ের বিচরণ ভূমি; ঘ্রাণ-শক্তি নাসিকায় বাস করে এবং গন্ধ গ্রহণ করে; গন্ধ ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের বিচরণ ভূমি। সেইজন্য শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধকে বিষয় বলে। এত বিশ্লেষণ করিয়া বলিবার তাৎপর্য্য হইতেছে এই যে, জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সূক্ষ্মতার অনুভূতি জাগান। মানুষ মরিলে দেহ পড়িয়া থাকে, জ্ঞানেন্দ্রিয় জীবাত্মার সহিত চলিয়া যায়। চক্ষু ত পড়িয়া রহিল, কিন্তু দর্শন-শক্তি চক্ষু ছাড়িয়া গেল; তাই চক্ষুকে না বলিয়া দর্শন-শক্তিকে দর্শনেন্দ্রিয় বলা হয়। এইরূপ অন্যত্র বুঝিতে হইবে। কার্য্যদ্বারাই জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সত্তা অনুমান করা যায়। শব্দ গ্রহণ করে বলিয়াই শ্রবণেন্দ্রিয়ের অস্তিত্ব অনুভূত হয়; স্পর্শ গ্রহণ করে বলিয়াই ত্বগীন্দ্রিয়ের অনুভব; রূপ গ্রহণ করে বলিয়াই দর্শনেন্দ্রিয়ের অনুভূতি জাগে; আস্বাদন কার্য্যের দ্বারাই জিহ্বার অস্তিত্ব এবং আঘ্রাণ করে বলিয়াই ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের অনুভব হয়। এই সকল ইন্দ্রিয় বাহ্য বিষয়ে প্রবৃত্ত হয়; বাহ্যবিষয় লইয়াই জ্ঞানেন্দ্রিয়ের খেলা। সাধারণতঃ বাহ্য বিষয় লইয়াই জ্ঞানেন্দ্রিয়ের খেলা বটে, বাহ্য বিষয়ে জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলিকে প্রায়ই প্রবৃত্ত হইতে দেখা যায় বটে, কিন্তু কখন কখন আন্তরিক বিষয় গ্রহণ করিতেও তাহাদিগকে দেখিতে পাওয়া যায়। কর্ণ আচ্ছাদন করিলে—দুই অঙ্গুলি সাহায্যে টিপিয়া ধরিলে, একটা শব্দ শোনা যায়; উহা আন্তরিক শব্দ। জলপান ও অন্নভক্ষণ কালে প্রাণ-বায়ুতে ও জঠরাগ্নিতে আন্তরিক স্পর্শ বোধ হয়; চক্ষু মুদ্রিত করিলে আন্তরিক অন্ধকার অনুভব হয়; উদ্‌গারে আন্তরিক রস ও গন্ধ অনুভব হয়; তা'হলেই দেখ, জ্ঞানেন্দ্রিয় যে কেবল বাহ্য বিষয় লইয়াই খেলা করে, বাহ্য বিষয়েই প্রবৃত্ত হয়, তা নয়, আন্তরিক বিষয়েও প্রবৃত্ত দেখা যায়।

বাক্য, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থকে কর্ম্মেন্দ্রিয় বলে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, ইহারা পঞ্চভূতের রজোগুণ হইতে জাত। বচন, গ্রহণ, গমন, পরিত্যাগ ও আনন্দ এই পাঁচটি পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়ের বিষয়। বাক্য অর্থাৎ

কথা বলিবার শক্তি মুখে অবস্থান করে ; গ্রহণ করিবার শক্তি হস্তে অবস্থিত, গমন-শক্তি পাদদ্বয়ে, পুরীষ-পরিত্যাগ-শক্তি পায়ুতে (গুহ্যদেশে) এবং প্রজনন-শক্তি উপস্থে (লিঙ্গে) সন্নিবিষ্ট। পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় আবার জড় ও স্থূল হইলেও উক্ত শক্তিগুলি সূক্ষ্ম ; এই সূক্ষ্মতা হেতু ভগবানের কর্ম্মেন্দ্রিয় ও জ্ঞানেন্দ্রিয় কল্পনা করা হয়। স্থূল দেহ তাঁহার না থাকিলেও সূক্ষ্ম দর্শন-শক্তি গ্রহণ-শক্তি, শ্রবণ-শক্তি ইত্যাদি তাঁর আছে ; তাই ভক্তের প্রাণের কথা তিনি শুনিতে পান, সভক্তি নিবেদিত নৈবেদ্যাদি তিনি গ্রহণ করেন, ভক্তের কাতর ডাকে তিনি সেখানে হাজির হন।

এই যে দশ ইন্দ্রিয়ের কথা বলা হইল, ইহাদের মালিক হইল মন। মনের হুকুম না পেলে ইহারা কাজে প্রবৃত্ত হয় না ; মনের আদেশে ইহারা উঠে বসে ; মনকে ইহারা মানিয়া চলে ; মনই ইহাদের প্রভু ; মনই ইহাদের নিয়ন্তা। মন বাস করে হৃদয়পদ্মমধ্যে। হৃদয়ের অন্তরে বাস করে বলিয়াই মনকে অন্তঃকরণ বলে। বাহ্য বিষয় লইয়া খেলা করিতে হইলে ইন্দ্রিয়-সাহায্য ব্যতিরেকে মন খেলিতে পারে না ; রূপ দেখিতে হইবে, চক্ষুর সাহায্য চাই ; গান শুনিতে হইবে, কর্ণের সাহায্য চাই, ইত্যাদি। কিন্তু আন্তরিক কার্য্যে মন স্বাধীন ; সেখানে ইন্দ্রিয় সাহায্য দরকার হয় না ; ধ্যান করিতে হইলে ইন্দ্রিয়-সাহায্য আবশ্যক হয় না ; মন একাই পারে। এখানে মন ইন্দ্রিয়ের অধীন নয়। অন্তর-বিষয়ে মন স্বাধীন হইলেও বাহ্য বিষয় ভোগ করিবার সময় সে ইন্দ্রিয়ের অধীন। পঞ্চভূতের সত্ত্বগুণের সমষ্টি হইতে মনের উৎপত্তি।

ইন্দ্রিয়গণ যখন বিষয় গ্রহণ করিয়া মনের নিকট হাজির করে, মন তখন তাহাদের দোষগুণ বিচারে প্রবৃত্ত হয় ; সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ মনের তিন গুণ; মন যখন যে গুণে থাকে, তাহার মত কার্য্য প্রকাশ পায় ; মন যখন সত্ত্ব গুণে থাকে, তখন ঔদার্য্য, বৈরাগ্য, ক্ষমা ইত্যাদি কার্য্যরূপে মন প্রকাশ পায় ; যখন রজোগুণে থাকে, তখন কাম, ক্রোধ, লোভ, বৈষয়িক প্রযত্নরূপে মনের কার্য্য প্রকাশ পায় ; যখন তমোগুণে থাকে, তখন আলস্য, ভ্রান্তি, তন্দ্রা ইত্যাদিরূপে মনের কার্য্য প্রকাশ পায়। সত্ত্বগুণ সম্ভূত বৈরাগ্যাদি হইতে পুণ্য উদ্‌ভূত হয় ; রজোগুণের বিকার কাম-ক্রোধাদি হইতে পাপ উৎপন্ন

হয় ; আর তমো গুণের বিকার আলস্যাদি হইতে পাপ বা পুণ্য কিছুই উৎপন্ন হয় না ; কেবল বৃথা কালক্ষেপ করা হয় মাত্র। এই সকল কার্য্য সহিত—পাপ পুণ্যের সহিত—জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয়ের কর্ত্তাই অহং শব্দবাচ্য জীব বলিয়াই জগতে প্রসিদ্ধ।

তাহা হইলে দাঁড়াইল এই যে, সৃষ্টির পূর্ব্বে কেবলমাত্র সৎ বস্তু ব্রহ্ম ছিলেন, "সদেব সৌম্যেদং অগ্রমাসীত"! তারপর তাঁর প্রতিবিম্বস্বরূপ সত্ত্ব-রজস্তমোগুণাত্মক প্রকৃতি তাঁর একদেশে প্রকট হইলেন। এই প্রকৃতির নাম মায়া ও অবিদ্যা। শাক্তেরা ইহাকেই মহামায়া, মহাশক্তি, কালী, দুর্গা ইত্যাদি নামে অভিহিত করিয়াছেন। ব্রহ্মবাদীরা ইহাকে ব্রহ্মশক্তি বলিয়াই জানিয়াছেন। শুদ্ধ সত্ত্ব প্রধান মায়াতে যে চৈতন্য প্রতিবিম্বিত হন, তাঁকে ঈশ্বর বলা হয় ; মলিন সত্ত্ব-প্রধান অবিদ্যাতে প্রতিবিম্বিত চৈতন্যের নাম প্রাজ্ঞ জীব। ঈশ্বর প্রাজ্ঞ-জীবের শরীর, ভোগ্য ও ভোগস্থান নির্ম্মাণের জন্য সূক্ষ্ম পঞ্চ ভূত সৃষ্টি করিলেন ও সৃষ্টিকার্য্যের সুবিধার জন্য তাহাদের পঞ্চীকরণ করিলেন। ঈশ্বর মায়াকে বশীভূত রাখিয়া কার্য্য করেন ; কিন্তু প্রাজ্ঞজীব অবিদ্যার অধীনে থাকিয়া কার্য্য করে। পঞ্চ ভূতের রজোগুণের সমষ্টি হইতে পঞ্চপ্রাণ উৎপন্ন হয়। পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ প্রাণ, মন ও বুদ্ধি এই সপ্তদশ অবয়ব সমষ্টিকে সূক্ষ্ম শরীর বা লিঙ্গ দেহ বলে। সূক্ষ্ম শরীরে অভিমানবিশিষ্ট প্রাজ্ঞজীবকে তৈজস বলে ; মলিন সত্ত্বপ্রধান প্রকৃতিকে অবিদ্যা বলে। এই অবিদ্যার অপর নাম কারণ-শরীর। অবিদ্যা-উপহিত চৈতন্যের নাম প্রাজ্ঞ ; সত্ত্বগুণের মলিনতার তারতম্যানুসারে তৈজস জীব দেব, মনুষ্য, অশ্ব, গো, বৃক্ষাদি বিভিন্ন নামরূপে প্রকাশ পায়। ঈশ্বর যখন স্থূল শরীরে অভিমান করেন, তখন তিনি বৈশ্বানর বা বিরাট নামে অভিহিত হন। পঞ্চীকৃত পঞ্চ মহাভূত হইতে ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যেই ১৪ ভুবন, ভোগ্য পদার্থ সকল ও তদ্ ভোগের উপযুক্ত শরীর সকল উৎপন্ন হয়। তৈজস যখন স্থূল শরীরে অভিমান করেন, তখন তাহাকে বিশ্ব বলে। দেব, মনুষ্য, গো, অশ্ব, বৃক্ষ লতাদি সমস্তই বিশ্ব পদের অন্তর্গত। মনের সত্ত্বগুণে অবস্থিতি হইতে পুণ্য ও রজোগুণে অবস্থিতি হইতে পাপ উৎপন্ন হয়।

পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও মন এই একাদশ ইন্দ্রিয় দ্বারা এবং

শাস্ত্র ও যুক্তি দ্বারা ইহলোকে যাহা কিছু অবগত হওয়া যায়, তাহাকে ইদং শব্দ বাচ্য জগৎ বলে। মন কর্ম্মেন্দ্রিয় ও জ্ঞানেন্দ্রিয় সাহায্যে যে জ্ঞান লাভ করে, তাহা জাগতিক জ্ঞান। আর এই জগৎ জ্ঞানকে শাস্ত্রে "ইদং" শব্দে প্রকাশ করিয়াছে। এই ইদং শব্দবাচ্য জগৎ সৃষ্টির পূর্ব্বে একমাত্র অদ্বিতীয় সৎ স্বরূপ পরমাত্মা ছিলেন, নাম বা রূপ কিছুমাত্র ছিল না। পরমাত্মায় কোন ভেদ নাই। ভেদ তিন রকম; স্বগত ভেদ, স্বজাতীয় ভেদ, বিজাতীয় ভেদ। বৃক্ষের পত্র, পুষ্প ও ফলের মধ্যে একটা ভেদ দেখা যায়; পত্র একজাতীয়, পুষ্প একজাতীয় এবং ফল অপর জাতীয়। কিন্তু পত্র পুষ্প ও ফল—এ সকলের সমষ্টি বৃক্ষ নামে পরিচিত। এই পত্র, পুষ্প ও ফলের মধ্যে যে ভেদ, উহাকে স্বগত ভেদ বলে। বেল ফুলের গাছ ও গোলাপ ফুলের গাছ উভয়ে গাছ শ্রেণীভুক্ত হইলেও তাহাদের মধ্যে ভেদ দৃষ্ট হয়; এই প্রকার ভেদের নাম স্বজাতীয় ভেদ। বৃক্ষের সহিত শিলাদির যে ভেদ, তাহাকে বিজাতীয় ভেদ বলে। পরমাত্মার স্বগত ভেদ নাই, স্বজাতীয় ভেদ নাই, বিজাতীয় ভেদ নাই। ত্রিবিধ ভেদের স্থান পরমাত্মায় নাই। ব্রহ্ম পরব্রহ্ম, পরমাত্মা এক বস্তুরই বিভিন্ন নাম; তাহারা একার্থক। ব্রহ্মের স্বরূপে কোন অবয়ব নাই। অতএব তাঁহার স্বরূপের স্বগত ভেদ বা অবয়বের বিভাগ সম্ভব হয় না। নাম বা রূপ তাঁহার স্বরূপের অংশ হ'তে পারে না। কেননা, নাম ও রূপের উৎপত্তির পূর্ব্বে নিত্য সিদ্ধ পরব্রহ্ম বর্ত্তমান ছিলেন। নাম ও রূপের উৎপত্তির নামই সৃষ্টি। সৃষ্টির পূর্ব্বে ব্রহ্মে কখনও নাম ও রূপের সত্তা সম্ভব নহে। নাম-রূপ থাকলেই ত স্বগত-ভেদ আছে দেখা যায়। ব্রহ্মে তখন নাম-রূপ না থাকায় স্বগত-ভেদ তাহাতে সম্ভব হয় না। পরব্রহ্ম নিত্য-জ্ঞান-আনন্দ-স্বরূপ; তাঁহার স্বরূপ বিবিধ প্রকার নহে, সুতরাং তাঁহার সমান জাতীয় অন্য কোন পদার্থের সত্তা জগতে সম্ভব হয় না; অতএব ব্রহ্মে সজাতীয় ভেদ সম্ভব নহে। পরব্রহ্ম সদ্বস্তু; তাঁহার বিপরীত জাতীয় বস্তু অসৎ; অসতের অপর নাম "নাস্তি"। যে অসৎ সে নাই, তাহার স্বরূপও নাই। অতএব তাহা দ্বারা সৎ স্বরূপ পরব্রহ্মের প্রভেদ হইতে পারে না। সুতরাং ব্রহ্মে বিজাতীয় ভেদ সম্ভব নহে। এই সকল যুক্তি দ্বারা নিত্য-জ্ঞান-আনন্দ-স্বরূপ অদ্বিতীয় পরব্রহ্ম একমাত্র ইহাই সিদ্ধ হইল।

বৌদ্ধ তপস্বীরা শ্রুতিকে অনাদর করিয়া বলিয়া থাকেন যে, জগদুৎপত্তির পূর্ব্বে শূন্য মাত্র ছিল। আচ্ছা, বিচার কর দেখি "শূন্য" শব্দের অর্থ অভাব; "ছিল" শব্দের অর্থ ভাব। যে ভাব, সেই অভাব—ইহা কিরূপে সম্ভব হয়। যেমন সূর্য্য অন্ধকার বিশিষ্ট ইহা বলা যায় না,—ন যুক্ত স্তমসা সূর্য্যো নাপি চাসৌ তমোময়ঃ—সূর্য্য অন্ধকারময়ও হইতে পারে না; অতএব ভাব ও অভাব এই উভয় শব্দের বিরোধহেতু "শূন্য ছিল" এ কথা কি প্রকারে যুক্তিসহ হইতে পারে? বেদান্ত মতে আকাশাদি ভূত সকলের নাম ও রূপ নির্ব্বিকল্পক পরব্রহ্মে মায়া দ্বারা কল্পিত হইয়াছে; সেইরূপ শূন্যেরও নাম ও রূপ মায়া দ্বারা সৎস্বরূপ ব্রহ্মে কল্পিত হইয়াছে—এরূপ যদি বল, তাহাতে কোন আপত্তি নাই; কেন না, তদ্দ্বারা ব্রহ্মের সত্তা স্বীকার করিতেছ। যদি বল, সৎ স্বরূপ পরব্রহ্মেরও নাম ও রূপ মায়া দ্বারা কল্পিত হইয়াছে, তবে বল দেখি, সেই নাম ও রূপ কোন্ বস্তুতে কল্পিত হইল? কল্পনা শব্দের অর্থ ভ্রম; তাহা কোন অকাল্পনিক বস্তুকে আশ্রয় করিয়া ঘটিয়া থাকে। আধার-শূন্য ভ্রম কখন কোন স্থানে দেখা যায় না। রজ্জুকে আশ্রয় করিয়া সর্প ভ্রম হইতে পারে; বিনা রজ্জুতে সর্পভ্রম সম্ভব নহে। বিনা আধারে ব্রহ্মের নাম-রূপ কল্পনা কিরূপে সম্ভব? সুতরাং ব্রহ্মের সত্তা স্বীকার করিতেই হয়। যদি বল, বেদান্তে জগদুৎপত্তির পূর্ব্বে কেবল সৎ মাত্র ছিলেন, এই বাক্যে সৎ শব্দের অর্থ বিদ্যমানতা এবং "ছিলেন" শব্দের অর্থও বিদ্যমানতা; তাহাতে এ স্থলে যদি পৃথক্ পৃথক্ শব্দের পৃথক্ পৃথক্ অর্থ কর, তবে দ্বিগুণ বিদ্যমানতা অর্থ হয়। আর যদি পৃথক্ পৃথক্ অর্থ না কর, তবে পুনরুক্তি দোষ হয়; অতএব "সৎ ছিলেন' ইহা বলিতে পার না। না, এ বিচার ঠিক হয় না; ইহা বলিতে পার না; কেন না, এরূপ পুনরুক্তি সংসারে ও শাস্ত্রে প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায়। যেমন কর্ত্তব্য করে, বাক্য বলে, ধার্য্য ধারণ করে ইত্যাদি।

যখন বেদান্তে পরব্রহ্ম সম্বন্ধে স্বগত, সজাতীয় ও বিজাতীয় ভেদ নাই, তখন কালের সত্তা কিরূপে কল্পনা করা যায়? জগৎ উৎপত্তির পূর্ব্বে কেবল একমাত্র সৎ ছিলেন,—এ কথায় পূর্ব্বকাল ব্যবহার কিরূপে সম্ভব হয়? বেদান্ত মতে অদ্বিতীয় বস্তু বিষয়ে "কালের" অভাব, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু কাল-ব্যবহার-বিশিষ্ট শিষ্যদিগের প্রতিই সেই "কাল" ব্যবহার উপদেশ

করিয়াছেন ; কাজেই অদ্বিতীয় ব্রহ্মতত্ত্বে সদ্বিতীয়ত্ব শঙ্কা হইতে পারে না। যতক্ষণ ব্যবহার আছে, ততক্ষণ দ্বৈত পক্ষ আছে ; দ্বৈত পক্ষে থাকিয়া যাহা কিছু বলা যায়. তাহা সকলই সম্ভব হয় ; কিন্তু পরমার্থভাবে অদ্বৈত পক্ষে তাহার কিছুই সম্ভব হয় না। পরমার্থতঃ এই জগৎ-সৃষ্টির-পূর্ব্বে অচল, নিস্তব্ধ, গম্ভীর, বাক্য মনের অগোচর, সর্ব্বব্যাপী, এবং সর্ব্বদা সমান, এক সৎ মাত্র ছিলেন। বেশ কথা ; পূর্ব্বে যখন একমাত্র সৎবস্তু ছিলেন, তখন পৃথিবী আদির পরমাণু পর্য্যন্তের অভাব স্বীকার করিতে হইবে। কেন না, তারা সৃষ্ট পদার্থ ; সৃষ্ট-মাত্রেরই নাশ আছে ; কিন্তু সে সময় আকাশের অভাব বুদ্ধিতে কিরূপে ধারণ করা সম্ভব ? অথচ তাহা স্বীকার না করিলেও অদ্বৈত সিদ্ধি হয় না। পৃথিব্যাদি স্থূল জগতের অভাব হইলেও অত্যন্ত জগৎশূন্য আকাশের ধারণা ত তুমি করিতেছ। কিন্তু আকাশও সৃষ্ট পদার্থ। সেইরূপ সেই আকাশেরও নাশ হইলে আকাশশূন্য কেবল নিত্যবস্তু ব্রহ্মকে বুদ্ধিতে ধারণা করা সম্ভব হইবে না কেন ? তুমি যদি আকাশের ধারণা করিতে পার, আকাশ বিনাশের পর ব্রহ্মের ধারণাই বা করিতে পারিবে না কেন ? আকাশ অতি সূক্ষ্ম, সকল সৃষ্ট বস্তুর আশ্রয়, এই ধারণা যদি তোমার হইতে পারে, তবে এ ধারণাও তুমি করিতে পারিবে যে, ব্রহ্ম আকাশ অপেক্ষাও সূক্ষ্ম, আকাশের আশ্রয়স্থল, সকল সূক্ষ্ম জড় বস্তু বিনাশে যেমন আকাশ ঠিক থাকে, তাহার হ্রাস বৃদ্ধি হয় না, সেইরূপ আকাশ বিনষ্ট হইলেও ব্রহ্মের হ্রাস বৃদ্ধি সম্ভব নয় ; তিনি যথা পূর্ব্বং তথা পরং থাকিয়া যান। তাঁর কোনই বিকার ঘটে না। তিনি তেজঃও নহেন, তমঃ ও নহেন। তুষ্ণীভাবে স্থিতিকালে সাধকেরা শুদ্ধ সৎবস্তু নিশ্চিতরূপে অনুভব করিয়া থাকেন ; সে সময়ে শূন্য অনুভূত হয় না। মনের সঙ্কল্পের অভাবকেই তুষ্ণীভাব বলে। তুষ্ণীভাবে স্থিতিকালে যেমন সৎবস্তু পরব্রহ্ম নিস্তব্ধ হইয়া সাক্ষীরূপে অবস্থিত হন, সেইরূপ মায়া ব্যাপারের পূর্ব্বে (জগৎ উৎপত্তির পূর্ব্বে) তাঁহার সাক্ষীরূপে অবস্থিতি অনুভূত হয়। পরব্রহ্ম হইতে পৃথক সত্তারহিত যে পরমাত্মশক্তি, তাহাকে মায়া বলে। যেমন দাহাদি কার্য্য দেখিয়া অগ্নির শক্তি অনুমান করা যায়, সেইরূপ জগত-কার্য্য দেখিয়া পরমাত্মশক্তি বোধে ফুটিয়া উঠে। অগ্নির দাহিকা শক্তিকে অগ্নির স্বরূপ বলা যায় না, সেইরূপ পরমাত্মশক্তি মায়াকে

পরব্রহ্মের স্বরূপ বলা যায় না। এই জগৎ উৎপত্তির পূর্ব্বে অসৎ ছিল না এবং পৃথক্ সত্ত্বা বিশিষ্ট কোন সৎ ও ছিল না; কিন্তু সে সময়ে তমঃ শব্দবাচ্য পরমাত্মশক্তিরূপ মায়া ছিল; তাহারও সত্তা পৃথক্ নহে, সৎবস্তু পরব্রহ্মের সত্তাতেই তাহার সত্তা।

নাসদাসীন্নো সদাসী-ত্তদানীং কিন্ত্বভূত্তমঃ
সদ্ যোগাত্তমসঃ সত্ত্বং ন স্বতন্তন্নিষেধনাৎ। পঞ্চদশী।

পরমাত্মশক্তি পরমাত্মার সত্তায় সত্তাবান্ হওয়ায় পরমাত্মার দ্বিতীয়ত্ব প্রমাণ হয় না। আবার এই পরমাত্মশক্তি পরব্রহ্মের সর্ব্বাবয়ব ব্যাপিনী ন কৃৎস্ন ব্রহ্মবৃত্তিঃ সা শক্তিঃ কিন্ত্বেক-দেশভাক্। পরমাত্মার এক পাদ সর্ব্বভূতে ব্যাপ্ত এবং তিন পাদ নিত্য শুদ্ধ মুক্ত স্বয়ং প্রকাশস্বরূপ।

পাদোঽস্য বিশ্বাভূতানি ত্রিপাদস্তি স্বয়ংপ্রভঃ
ইত্যেকদেশবৃত্তিত্বং মায়য়া বদতি শ্রুতিঃ।

ভগবদ্ গীতার দশম অধ্যায়ের শেষ শ্লোকে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এই বিষয়ে অর্জ্জুনকে উপদেশ করিয়াছেন—শরীরের কিয়দংশ দ্বারা এই সমুদায় জগতকে ব্যাপিয়া আমি অবস্থিতি করিতেছি "একাংশেনস্থিতো জগৎ।" শারীরক মীমাংসার ৪র্থ অধ্যায়ের ৪র্থ পাদের উনবিংশতি সূত্র ও ইহার প্রমাণ; সেখানে বলা হইয়াছে পরমেশ্বরের স্বরূপ কেবল বিকার দ্বারা আবৃত নহে; তিনি অনাবৃত স্বভাবেও স্থিতি করেন,—বিকারাবর্ত্তি চাত্রাস্তি। পরমাত্মা দশাঙ্গুলং ভূমিং সর্ব্বতো বৃত্বা—দশেন্দ্রিয়গ্রাহ্য দেশ (জগৎ) সর্ব্বতোভাবে আবৃত করিয়া (অতি অতিষ্ঠৎ) অবস্থিতি করিতেছেন; জগতের মধ্যে অবস্থান করিতেছেন এবং জগতকে অতি অতিষ্ঠৎ অতিক্রম করিয়া বিকার বর্জ্জিত দেশেও নিত্য শুদ্ধ মুক্তরূপে অবস্থিত আছেন।

যদি বল, পরব্রহ্ম নিরবয়ব, সুতরাং তাঁহার স্বরূপের অংশ সম্ভব হয় না; অতএব তাঁহার স্বরূপের কোন অংশ বিকার ব্যাপী, কোন অংশ অনাবৃত অবিকৃত, ইহা কি প্রকারে যুক্তিসিদ্ধ হয়? নিরংশ নির্ব্বিকার পরব্রহ্মে অংশ আরোপ করিয়া পরম হিতৈষিণী শ্রুতি প্রশ্নকারী শিষ্যদিগের প্রতি উক্ত প্রকার অংশচ্ছলে উপদেশ করিয়াছেন। পরমাত্মশক্তি মায়া সদ্-বস্তু পরব্রহ্মকে আশ্রয় করিয়া তাঁহাতেই বিবিধ প্রকার বিকার বা কার্য্য সকল

কল্পনা করে। পরমাত্মশক্তি মায়ার প্রথম কার্য্য আকাশ; তাহার স্বরূপ অবকাশ বা শূন্যস্বভাব; আকাশ ব্রহ্মশক্তি মায়ার কার্য্য; সুতরাং পরমাত্মার সত্তাতেই তাহার সত্তা। পরমাত্মা মাত্র এক স্বভাব, কিন্তু পরমাত্মশক্তিজাত আকাশের দুই স্বভাব—অবকাশ ও সত্তা। আকাশের দুই গুণ সত্তা ও প্রতিধ্বনি, কিন্তু পরমাত্মার গুণ এক সত্তা মাত্র, তাঁহাতে প্রতিধ্বনি গুণ নাই। যে ব্রহ্মশক্তি মায়া আকাশকে কল্পনা করে, আকাশরূপ কার্য্য উৎপন্ন করে, সেই মায়াই সদ্ব্রহ্মের সহিত আকাশের অভিন্নতা প্রতিপাদন করে এবং সঙ্গে সঙ্গে বিপরীত ক্রমে তাহাদের মধ্যে ধর্ম্মী ধর্ম্ম-ভাবও কল্পনা করে, অর্থাৎ পরব্রহ্মেই মাত্র সত্তা আছে, আর কোন বস্তুরই সত্তা নাই; তবে যে আকাশের সত্তা বলিয়া যে ব্যবহার, সে কেবল মায়া দ্বারাই কল্পিত হয়। বস্তুতঃ পরমাত্মার সত্তাতেই আকাশের সত্তা; স্বরূপতঃ আকাশ নিত্য বস্তু নহে, জন্য বস্তু। কিন্তু ইহাকে সাধারণ লোকে নিত্য বলিয়া মানে; সে কেবল মায়ার কার্য্য; কেননা, মায়ার স্বভাবই হ'ল, একরূপকে অন্যরূপে কল্পনা করা। যে বস্তুর যে প্রকার স্বরূপ, প্রমাণ দ্বারা তাহার যথা স্বরূপ প্রতিভাত হয়, এবং ভ্রমদ্বারা তাহার বিপরীত প্রকার দৃষ্ট হয়। পূর্ব্বোক্ত প্রকার শ্রুতিবিচারের পূর্ব্বে আকাশাদি যে সকল বস্তু যে প্রকারে প্রতীয়মান হয়, পশ্চাৎ বিচার দ্বারা তাহার বিপর্য্যয় অনুভব হয়। তাহা হইলে বিবেচনা করিয়া দেখ, আকাশাদি বিষয় নিত্য বস্তু হয় কি না। সদ্ বস্তু পরব্রহ্ম হইতে আকাশ পৃথক, যেহেতু আকাশ এবং সৎ এই উভয় শব্দের ভেদ আছে এবং আকাশের কার্য্য বায়ুতে সত্তাগুণ অনুবৃত্ত হয়, কিন্তু আকাশ অনুবৃত্ত হয় না। সর্ব্বব্যাপী হেতু সদ্বস্তু ধর্ম্মী ও আকাশ ধর্ম্ম; এইরূপ যুক্তিদ্বারা সদ্বস্তু হইতে আকাশকে পৃথক করিলে বল দেখি আকাশের স্বরূপ আর কি থাকে? অর্থাৎ কিছুই থাকে না। যদি বল প্রত্যক্ষ ভাসমান আকাশ যদি অসৎ হইত, তবে প্রত্যক্ষরূপে ভাসমান হইত না। অতএব আকাশ অসৎ নহে। না, এরূপ বলিতে পার না; কারণ, মায়িক পদার্থের লক্ষণই এই যে, অসৎ হইয়াও ভাসমান হয়; স্বপ্ন দৃষ্ট বস্তুর ন্যায় যে বস্তু অসৎ হইয়াও ভাসমান হয়, তাহাকে মিথ্যা বলে। জাতি ও ব্যক্তি, জীব ও দেহ, গুণ ও দ্রব্য ইহারা যে প্রকার পরস্পর পৃথক্, আকাশ ও

সদ্‌বস্তুর বিভিন্নতাও তদ্রূপ। যদি বল সৎ ও আকাশের প্রভেদ বোধগম্য হইল বটে, কিন্তু তাহাতে আমার দৃঢ় বিশ্বাস হইতেছে না, তবে নিশ্চয় বল দেখি, তদ্‌ বিষয় তোমার দৃঢ়তা না হইবার কারণ কি? যদি অনবধানতা কারণ হয়, তবে ধ্যান-সাধন দ্বারা তদ্‌বিষয়ে একাগ্রচিত্ত হও; কিম্বা সংশয় যদি কারণ হয়, তবে শাস্ত্রপ্রমাণ দ্বারা এবং যুক্তি দ্বারা বিবেচনাপূর্ব্বক সৎ ও আকাশের প্রভেদ দৃঢতররূপে অবগত হইলে, আকাশের সত্যত্ব জ্ঞান বা সদ্‌বস্তুর আকাশ-ধর্ম্মত্ব জ্ঞান হওয়া আর কখনও সম্ভব হয় না। প্রাজ্ঞ ব্যক্তির নিকট আকাশ সর্ব্বদা অনিত্যরূপে ব্যবহৃত হয়। এবং সদ্‌ বস্তুও তাঁহার নিকট সর্ব্বদা নিত্য শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত স্বরূপে প্রকাশ পায়। পূর্ব্বোক্ত প্রকার শাস্ত্র ও যুক্তি দ্বারা আকাশের মিথ্যাত্ব ও সদ্‌ বস্তুর সত্যত্ব সাধন পূর্ব্বক পঞ্চভূতের মধ্যে প্রথম ভূত আকাশ হইতে পরমাত্মার পৃথক্‌করণ রূপ বিচার এখানে শেষ হইল। এইরূপে পঞ্চভূতের অনিত্যতা ও সদ্‌বস্তুর নিত্যতা স্বীকার করিতে হয়।

পঞ্চীকৃত পঞ্চভূতের যোগেই এই ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি। আর সেই ব্রহ্মাণ্ডে ভূরাদি চতুর্দ্দশ ভুবন, আর সেই চতুর্দ্দশ ভুবনে যথাযোগ্য প্রাণীসকল বাস করে। ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্ব্বর্ত্তী লোকসকলের ভৌতিক শরীর হইতে পূর্ব্বোক্ত বিচারে সদ্‌বস্তুকে পৃথক কর, করিয়া দেখ যে, ব্রহ্মাণ্ডাদি অসদ্রূপে বিবেচিত হইয়াও দেদীপ্যমান্‌ রহিয়াছে; এবং দেদীপ্যমান্‌ থাকা সত্ত্বেও অদ্বৈত সদ্‌বস্তুর কোন ক্ষতি হয় না। যখন সাধক বেশ বুঝিতে পারে যে ভূতসকল, ভৌতিক পদার্থ-সকল ও মায়া—ইহারা অসৎ বস্তু, তখন আর তাহার সদ্‌বস্তুর অদ্বৈতজ্ঞানের কখনো বিপর্য্যয় হয় না। পঞ্চভূত ও তদ্‌জাত ভৌতিক পদার্থগুলি অসৎ মিথ্যা; ইহা যখন সাধকের অনুভূতিতে ফুটিয়া উঠে, উপলব্ধি হয়, তখন আর তাহার অদ্বয়জ্ঞানের বিপর্য্যয় আশঙ্কা থাকে না। যখন সাধকের ব্রহ্মজ্ঞান হয়, সদ্‌বস্তুর নিত্যত্ব সম্বন্ধে আর সন্দেহ সংশয় থাকে না, ভূত ও ভৌতিকাদি দ্বৈত পদার্থ সকলের মিথ্যাত্ব নিশ্চয় হয়, তখন সেই সাধকের (ব্রহ্মজ্ঞানীর) ব্যবহারিক বিষয়ে ব্যবহার লোপ পায় না; কেননা ভূত ও ভৌতিক পদার্থ গুলির মিথ্যাত্ব জ্ঞান হইলেও তাহারা বিদ্যমান থাকে; সুতরাং তদ্‌বিষয়ে ব্যবহারও হইতে পারে। তাই শ্রুতি বলিয়াছেন,—

সদদ্বৈতাৎ পৃথক্‌ভূতে দ্বৈতে ভূম্যাদিরূপিণী
তত্তদর্থ ক্রিয়া লোকে যথা দৃষ্টা তথৈব সা।

সাংখ্য, কানাদ. বৌদ্ধবাদীরা শ্রুতিসিদ্ধ অদ্বৈত সদ্‌বস্তুর প্রতিপাদনে অনাদর করিয়া থাকেন; তা তাঁহারা করুন; তাহাতে আমাদের কিছুই ক্ষতিবৃদ্ধি নাই। আমরাও শ্রুতি, যুক্তি ও অনুভব দ্বারা অনিত্য জানিয়া তাহাদিগের দ্বৈত প্রতিপাদনে অবজ্ঞা করি; কেন না, দ্বৈত বিষয়ে অবজ্ঞা দৃঢ়তর হইলে অদ্বৈত-জ্ঞান ক্রমশঃ বিশেষরূপে স্থিরীকৃত হয়। যে সাধকের দ্বৈত-বিষয়ে অনাদর অবজ্ঞাপূর্ব্বক অদ্বৈত-জ্ঞান দৃঢ়তর হইয়াছে, তাহাকেই জীবন্মুক্ত বলে। দ্বৈতবিষয়ে অবজ্ঞাপূর্ব্বক অদ্বৈত জ্ঞান দৃঢ়তর হইলে যে কেবল জীবন্মুক্তি মাত্র ফল হয়, তাহা নহে; তদ্দ্বারা নির্ব্বাণ-মুক্তি সাধক লাভ করে। তাই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ভগবদ্-গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ের দ্বিসপ্ততি শ্লোকে বলিয়াছেন,—উক্তপ্রকার জ্ঞানী জীবন্মুক্ত পুরুষ কখন মুহ্যমান্ হন না। তত্ত্বজ্ঞানের অনুষ্ঠাতা পুরুষ অন্তকালে নির্ব্বাণ মুক্তিরূপ ব্রহ্মানন্দ লাভ করেন।

এষা ব্রাহ্মীস্থিতিঃ পার্থ নৈনাং প্রাপ্য বিমুহ্যতি
স্থিত্বাস্যামন্তকালেঽপি ব্রহ্মনির্ব্বাণমৃচ্ছতি।

উক্ত শ্লোকে "অন্তকাল" শব্দের তাৎপর্য্য বোঝ, বুঝিয়া নিশ্চিত হও, সর্ব্ব-সংশয় দূর কর। "অন্তকাল" শব্দের লোক-প্রসিদ্ধ অর্থ হচ্চে প্রাণ বিয়োগ সময়। সেই প্রাণবিয়োগ সময়েও তত্ত্বজ্ঞ পুরুষের আর ভ্রান্তি উপস্থিত হয় না; ব্যবহারকালে বিষয়-বাসনা দ্বারা সৎস্বরূপ অদ্বৈত বস্তু ও অসৎ স্বরূপ দ্বৈতবস্তু এ উভয়ের ঐক্যজ্ঞান. থাকে; পশ্চাৎ তত্ত্ব বিচার দ্বারা তদুভয়ের যে ভেদজ্ঞান হয়, তাহাকে 'অন্তকাল' বলে। ইহাই অন্তকালের বৈদিক তাৎপর্য্য। এই অন্তকালে সাধকের আর ভ্রান্তি উপস্থিত হয় না। সেই জীবন্মুক্ত পুরুষ অন্তকালে নীরোগ শরীরে উপবিষ্ট হইয়া প্রাণত্যাগ করুন বা রোগাক্রান্ত হইয়া ভূমিতে লুণ্ঠন পূর্ব্বক প্রাণত্যাগ করুন, অথবা মূর্চ্ছাপন্ন হইয়াই প্রাণত্যাগ করুন, কোন প্রকারেই তাঁহার আর ভ্রান্তি উপস্থিত হয় না। কত বড় আশার কথা! কত বড় সান্ত্বনার বাণী !! কত বড় প্রাণরাম শান্তি মন্ত্র !!!

নীরোগ উপবিষ্টো বা রুগ্নো বা বিলুণ্ঠন্ ভুবি
মূর্চ্ছিতো বা ত্যজেদেব প্রাণান্ ভ্রান্তি নর্ সর্ব্বদা ॥

প্রাণবিয়োগকালে মূর্চ্ছাপন্ন হইলেও অদ্বৈত তত্ত্বজ্ঞানী জীবন্মুক্ত পুরুষ কদাপি বিদেহকালে অদ্বৈতজ্ঞান বিস্মৃত হন না। যেমন অজ্ঞানী ব্যক্তির প্রাত্যহিক স্বপ্ন বা সুষুপ্তিকালে অধীতবিদ্যা বিস্মরণ হইলেও জাগ্রতকালে তাহা আর অনধীত থাকে না, সেইরূপ বিদেহকালে তত্ত্বজ্ঞানীর অদ্বৈতজ্ঞানের বিস্মৃতি হয় না। তাই শ্রুতিতে দেখিতে পাই,—

দিনে দিনে স্বপ্নসুপ্তোরধীতে বিস্মৃতেঽপ্যয়ম্
পরেদ্যুর্নানধীতঃ স্যাৎ তত্ত্ববিদ্যা ন নশ্যতি।

কোন এক প্রমাণ দ্বারা নিশ্চিত কোন বস্তুবিষয়ক জ্ঞান তাহা হইতে প্রবল প্রমাণ ব্যতিরেকে বিপর্য্যস্ত হয় না। অতএব বেদান্ত প্রমাণ দ্বারা প্রতিপাদিত অদ্বৈত-তত্ত্বজ্ঞান অন্তকালেও বিপর্য্যস্ত হয় না; কেননা, বেদান্ত হইতে প্রবল প্রমাণ আর নাই। অতএব স্বতঃপ্রমাণ রূপ বেদান্তে প্রতিপাদিত উক্তপ্রকার ভূত-বিচার দ্বারা পঞ্চভূতের খেলার সম্যক্ উপলব্ধি দ্বারা অবশ্য ব্রহ্মানন্দ প্রাপ্তি ঘটে।

পঞ্চভূতের বিচার দেখ্‌লি ত, মন; তবে আর কেন পঞ্চভূতের মায়ায় মজে থাকবি? পঞ্চভূতের তৈরী বিষয়বৈভব দেখে যদি পঞ্চভূতের আদি নিদান ব্রহ্মশক্তিকে না মনে পড়ে, তবে তোর বেদান্ত পড়া বৃথা। পঞ্চভূতের তৈরী পুত্র-পরিবার আত্মীয়স্বজন দেখে যদি ব্রহ্মশক্তি মহামায়াকে না মনে পড়ে, তবে তোর সন্ন্যাস-আশ্রয় বৃথা। পঞ্চভূতের তৈরী কামিনী-কাঞ্চন দেখে যদি তোর পঞ্চভূতের মূল কারণ ব্রহ্মশক্তিকে মনে না পড়ে, তবে তোর ব্রহ্মবিদ্যা আলোচনা করা বৃথা। পঞ্চভূতের খেলা দেখ্‌তে এসে যদি ব্রহ্মশক্তি জগৎ-জননীকে না চিন্‌তে পার্‌লি, তবে তোর সাধন-ভজন বৃথা! পঞ্চভূতের তৈরী দুনিয়া দেখে, তার মালিক আদ্যাশক্তি মহামায়ীকে যদি প্রাণ ভরে "মা" বলে না ডাক্‌তে পার্‌লি, তবে তোর ফুল ছোঁড়াছুড়ি বৃথা। পঞ্চভূতের তৈরী ধূপ-ধূনা-চন্দনের গন্ধ পেয়ে যদি গন্ধাতীতকে না মনে পড়ে, তবে তোর গন্ধ নিবেদন বৃথা। শিশুর কাকলি, যুবতীর কলহাস্য শুনে যদি তোর শব্দাতীতকে না মনে পড়ে, তবে তোর স্তবস্তুতি পাঠ, বেদান্ত শ্রবণ বৃথা। পঞ্চভূতের বিচারের পর দুনিয়ায় তুই যদি রাগদ্বেষের বশীভূত থাকিস্, তবে তোর মুক্তি বহু দূরে।

তাই বলছি মন, আয় ছুটে আয়, পেছনে আর চাস্ না, এগিয়ে আয়,

ছুটে চলে আয়, ব্রহ্মশক্তি মহামায়ীর পা দুটো দু'হাতে জড়িয়ে ধর. চখের জলে পা দু'খানি ধুইয়ে দে, খুব কাঁদ, কেঁদে কেঁদে বল—ব্রহ্মশক্তি মা আমার, আমার আমিত্ব ঘুচিয়ে দাও মা ; আমার বলতে যা কিছু আছে, তোমার ক'রে নাও মা ! এস—এস, মা আমার ! হৃদয় আলো ক'রে বস মা ! অজ্ঞান অন্ধকার চিরতরে ঘুচে যাক্ মা ! শক্তি ও শক্তিমানের অভেদ জ্ঞান ফুটে উঠুক মা ! কোলে তুলে নে মা—ওমা, আমার আমিত্বকে ভেঙেচুরে তুমিময় ক'রে নে মা ! পঞ্চভূতের খেলা শেষ হয়ে যাক্ মা !! দেহ মন প্রাণ ঘুচে গিয়ে মায়ের কোলে উঠে মায়ের অঙ্গে অঙ্গ মিশিয়ে মা হয়ে যাই মা !!! ব্রহ্মশক্তি অব্যক্ত ব্রহ্মে লীন হ'ক মা ! ওঁ মা ! মা !! মা !!!

শান্তি-আশ্রম, চুঁচুড়া — ৬ই শ্রাবণ, ১৩৪৮

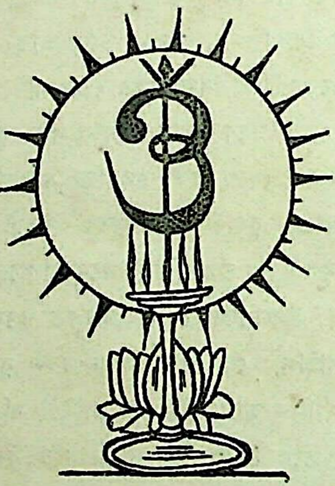

LIBRARY
No. ....
Shri Shri ... Ashram
BANARAS.

বিজ্ঞাপন

গ্রন্থকারের অন্যান্য পুস্তক

১। পুরুষকার দ্বারা প্রারব্ধক্ষয় শাস্ত্রসিদ্ধান্ত কি না ?

২। সোণার সংসার ও সংসার হইতে মুক্তির উপায়।

—প্রাপ্তিস্থান—

১। সনাতন ধর্ম্মপ্রচারিণী সভা

শ্রীশ্রীনগেন্দ্র মঠ

২/বি রামমোহন রায় রোড, কলিকাতা।

২। গ্রন্থকার, হুগলী কলেজ

চুঁচুড়া—পোঃ, জিলা—হুগলী